স্বামী
B
294.5831
-DAM/BAL-
ed.-2
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

কলিকাতা

১৩৭০

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

অতি আনন্দের কথা, অধুনা স্বামী বিবেকানন্দজীর জীবন-চরিত অনুশীলনের ইচ্ছা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রদীপ্ত হইয়াছে। সেই কারণ বশতঃ গ্রন্থটি দ্বিতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

বর্তমান সংস্করণে "ছবি আঁকা ও গান গাওয়া" শীর্ষক অনুচ্ছেদটি নূতন সংযোজিত হইয়াছে। কনিষ্ঠ সহোদর ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রশ্নে গ্রন্থকার স্বামিজীর বাল্য-জীবন সম্পর্কে এইরূপ ঘটনার কথা বলিয়াছেন এবং তাহা ডঃ দত্তের "Swami Vivekananda, Patriot Prophet গ্রন্থে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত এই সংস্করণে পূর্বের সামান্য ভুলত্রুটী সংশোধিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইল।

মানবপ্রেমিক বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জীবন-চরিত অনুধ্যানে জাতীয় জীবন উদ্বুদ্ধ হউক এই প্রার্থনা। ইতি

রথযাত্রা
৮ই, আষাঢ় ১৩৭০

বিনীত
শ্রীবরেন্দ্রনাথ নিয়োগী
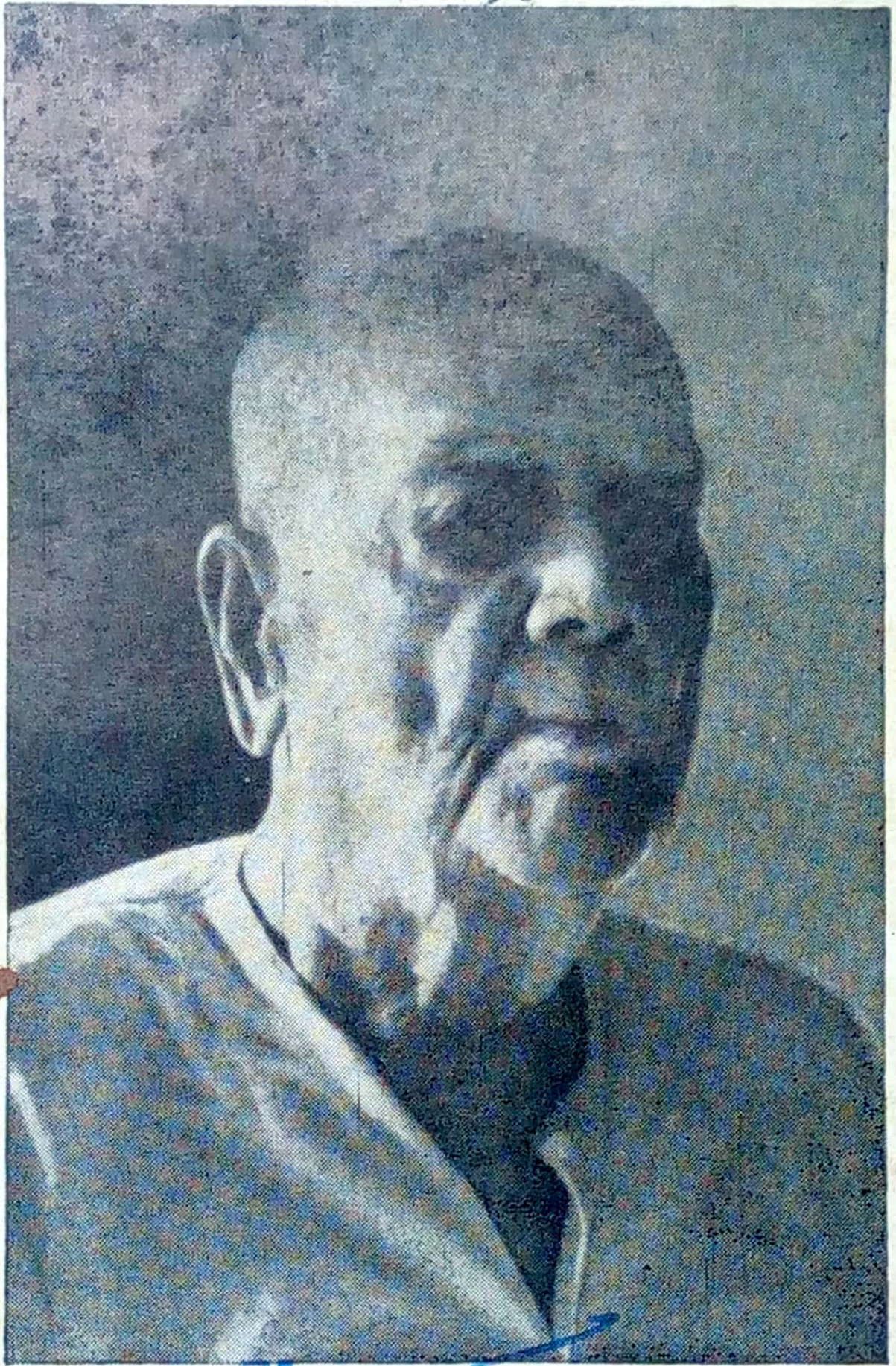
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

মুখবন্ধ

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার তাঁহার পরিণত বয়সে কথাপ্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলেন, "স্বামিজীর বাল্যজীবনীতে আরও কিছু যোগ করে সমাপ্ত করে দোবো ; আমাকে মাঝে মাঝে মনে করে দিও।" কিন্তু অতি বৃদ্ধ বয়স বশতঃ অক্ষমতা হেতু পরে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "কেউই সব কাজ সম্পূর্ণ করে যেতে পারে নি, আমারও কিছু কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।"

কিন্তু যতটুকু তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা বিবেকানন্দ-বাল্যচরিতের একটি নূতন দিক, তাহা বর্ণনামাধুর্যে জীবন্ত, মৌলিকত্বে বিশিষ্ট—একটি অমূল্য সম্পদ।

স্বামী বিবেকানন্দ-অনুজ দার্শনিক গ্রন্থকার অগ্রজ হইতে বয়সে ছয় বৎসরের ছোট। সুতরাং বাল্যকালে একত্রে খেলাধুলা, পাঠাভ্যাস প্রভৃতি করিয়াছিলেন। তাই বালক বীরেশ্বরের মনোগতির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল গ্রন্থকারের। পরবর্তীকালেও বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ যখন লণ্ডনে বক্তৃতা করিতেছেন তখনও তাঁহার সমীপে গ্রন্থকারকে দেখিতে পাই। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থকার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগ আন্দোলনের আদি হইতেই স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

বিশ্ববিশ্রুত মহাপুরুষ বিবেকানন্দের বাল্য-জীবনী বর্ণনায় গ্রন্থকার নানারূপ অলৌকিকত্ব আরোপ করিয়া তাঁহাকে প্রথমেই মহাপুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান নাই ; বরং সাধারণ মানবশিশুরূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে শিশু বীরেশ্বর তাহার বিদ্যাবত্তার, স্মৃতি-

শক্তির পরিচয় দিতেছে, খেলাধুলায় তাহার নেতৃত্ব, কৃতিত্ব ও ব্যক্তিত্ব দর্শাইতেছে, গল্পবলার দক্ষতায় অপর সকলকে মোহিত করিতেছে, যাত্রাগান দেখিয়া অবিকল নকল করিয়া কৌতুকানন্দ দিতেছে,—এই সকল শিশুচরিত্র এইগ্রন্থে অপরূপভাবে রূপায়িত হইয়াছে। তিনি নানা ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহার পিতা, পিতামহ, মাতা, মাতামহী, প্রমাতামহী প্রভৃতির গুণাবলী ও চরিত্র তথা বংশের বিশেষ ভাবধারা কিরূপে শিশু বীরেশ্বরের চরিত্রে প্রতিজ্জীবিত হইয়াছিল ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, যাহা উত্তরকালে নানাকারণে বিশেষরূপে পরিবর্ধিত হইয়া বিবেকানন্দ চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছিল। ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীতে যেমন নানাদিক হইতে স্রোতধারা মিলিত হইলে তাহা ক্রমে বিরাটরূপ ধারণ করে, বালক বীরেশ্বরের চরিত্রেও তাহার পরিবেশের নানাদিক হইতে পুণ্যশক্তিধারা মিলিত হওয়ায় মহান্ মানবচরিত্রসৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল। ইতি

রথযাত্রা
২৩শে আষাঢ় ১৩৬৬।

বিনীত
শ্রীবরেন্দ্রনাথ নিয়োগী

সূচী

বিষয়			পৃষ্ঠাঙ্ক

To the Ramakrishna Math,
Belur.
S.C. Dutta
11-3-67

স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী

বংশ-পরিচয়

বিশ্ববিশ্রুত শক্তিমাম মহাপুরুষের বাল্যকথা ও শৈশবের মনোবৃত্তি কিরূপ ছিল অনেকেরই তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। এইজন্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত বা বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যকালের কয়েকটি কথা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হইল।

তাঁহার বাল্যজীবনের ঘটনাবলী জানিতে হইলে বংশের একটু পরিচয় জানা আবশ্যক, এইজন্য এস্থলে সামান্যভাবে বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হইল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে এই দত্তবংশ আদিতে 'আমলহাড়া' নামক কোনও স্থানে বাস করিতেন। একটি ছড়া আছে ঃ—

কে জানে আমার তত্ত্ব
আমলহাড়ার দত্ত।

তাহার পর এই বংশ হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ার সন্নিকটে 'ডেরেটোন' নামক গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাহার পর ইংরাজী আমলের প্রক্কালে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এখন যেস্থলটিকে 'গড়ের মাঠ' বলে, পূর্বে উহাকে 'গোবিন্দ-পুর' বলিত। এই গোবিন্দপুরে ইঁহারা বাস করেন। পরে কেল্লা নির্মাণকালে গোবিন্দপুর ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং এই দত্তবংশ শিমুলিয়া বা কলিকাতা গ্রামে উঠিয়া আসেন। বংশেতে

এইরূপ প্রবাদ আছে যে ইঁহারা জঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্য কোম্পানি হইতে ১৪৲ টাকা পাইয়াছিলেন এবং অনেকটা জমি পরিষ্কার করিয়া বসতবাটী নির্মাণ করিয়াছিলেন।

প্রথমে তাঁহারা শিমলা স্ট্রীটের একস্থানে বাস করেন। সেটি এখন রাস্তা হইয়া গিয়াছে। তাহার পর ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। এই বংশের গোত্র হইল 'কাশ্যপ'।

*** বংশ পর্যায়**

কয়েক পুরুষের নামমাত্র আমি জ্ঞাত আছি। যথা, রামনিধি দত্তের পুত্র রামজীবন দত্ত, তাঁহার পুত্র রামসুন্দর দত্ত। রামসুন্দরের পাঁচ পুত্র—রামমোহন, রাধামোহন, মদনমোহন, গৌরমোহন ও কৃষ্ণমোহন। ইঁহাদের মধ্যে রামমোহন ও কৃষ্ণমোহনের বংশ আছে, অপর তিনজনের বংশ নাই। রাম-মোহন দত্ত প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া দুটি নাবালক সন্তান দুর্গাপ্রসাদ দত্ত ও কালীপ্রসাদ দত্ত এবং কয়েকটি কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। দুর্গাপ্রসাদ তখনকার প্রথানুযায়ী ষোল বা সতের বৎসর বয়সে শ্যামবাজারের দেওয়ান রাজীবলোচন ঘোষের কন্যা শ্যামাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। কালীপ্রসাদ দত্ত জয়নগর মজিলপুরের কৃষ্ণমোহন মিত্রের দুহিতা

---

* গ্রন্থকার প্রণীত গুরুপ্রাণ রামচন্দ্র দত্তের অনুধ্যান পুস্তকে এই বংশের পরিচয় বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সঃ

বিশ্বেশ্বরীকে বিবাহ করেন। দুর্গাপ্রসাদের এক পুত্র—বিশ্বনাথ দত্ত। কালীপ্রসাদের দুই পুত্র কেদারনাথ ও তারকনাথ। বিশ্বনাথের তিন পুত্র—নরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ। ইঁহার অন্যান্য পুত্র ও কন্যা হইয়াছিল, তাহারা শৈশবেই মারা যায়, কেবল চারি কন্যা বড় হইয়াছিল। তাহাদের নাম—হারামণি, স্বর্ণলতা, কিরণবালা ও যোগেন্দ্রবালা। মোটামুটি দশটি সন্তানের মধ্যে সাতজন বড় হইয়াছিল।

বাড়ীর বিবরণ

গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটের বাড়ী খুব প্রশস্ত ছিল। বাড়ীর অভ্যন্তর দেড় বিঘা ছিল এবং আশেপাশে অনেক জমিতে রেওয়ত ছিল। বাড়ীর বর্ণনা বলিতে হইলে প্রথম ঠাকুরদালান হইতে আরম্ভ করিতে হয়। পাঁচফুকুরী ঠাকুর-দালান পশ্চিমমুখী অর্থাৎ ইহার পাঁচটি খিলান ও ঘসা গোল ইঁটের থাম। ঠাকুরদালানের সম্মুখে বড় প্রাঙ্গন। ঠাকুর-দালানের উপরের দক্ষিণদিকে দুইতলা বড় বড় হলঘর। উত্তরদিকের ঘরটিকে 'বড় বৈঠকখানা ঘর' বলা হইত। দক্ষিণ দিকের নীচের ঘরটিকে 'বোধন ঘর' বলা হইত এবং উপকার ঘরটিকে 'ঠাকুর ঘর' বলা হইত। তাহার পর বাহিরের উঠানে চকমিলান দালান ও ঘর। অন্দরমহলে দুইদিকে দুটি উঠান ছিল এবং পিছনদিকে কানাচ বা পুকুর ছিল। এই হইল মোটামুটি বাড়ীর বর্ণনা।

বৈঠকখানা ঘরেতে দেওয়ালগিরি, বেল লণ্ঠন ও হাঁড়ির লণ্ঠন ছিল। কারণ তখনকার দিনে বাতি বা তেলের গেলাসের প্রথা ছিল। দেওয়ালে নানারকম ছবি টাঙ্গান থাকিত। এইরূপে সব বৈঠকখানাই বেশ সুসজ্জিত ছিল। তবে বিশ্বনাথ দত্তের নিজের বৈঠকখানাটি বিশেষ রকমে সুসজ্জিত ছিল।

পিতামহ

পিতামহ দুর্গাপ্রসাদের প্রথম একটি কন্যা হয় এবং অল্প দিন পরই মরিয়া যায়। তাহার পর পুত্র বিশ্বনাথ জন্মায়। এই বিশ্বনাথের ৬।৭ মাস বয়সে অন্নপ্রাশনের সময় দুর্গাপ্রসাদ ২০।২২ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাঁহার বিষয়ে গুটিকতক উপাখ্যান আছে। তিনি কাশী বা অপরস্থলে বাস করিতেন। প্রব্রজ্যার ১২।১৪ বৎসরের পর একবার তিনি কলিকাতায় আসিয়া অপর এক বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীপ্রসাদ দত্ত লোকের পরামর্শ অনুযায়ী দুর্গাপ্রসাদকে পাল্কীতে বসাইয়া দ্বারবান বেষ্টন করিয়া গৌরমোহন মুখার্জির গলির বাড়ীতে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং ঠাকুরদালানের দক্ষিণদিকে যে বোধনঘর ছিল, সেই ঘরে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। কিন্তু দুর্গাপ্রসাদ তিনদিন সেই ঘরে অনবরত জপ করিয়াছিলেন এবং সংসারের প্রদত্ত কোন বস্তু বা জল পর্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে সকলে ভীত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে

বলেন। সাধু দুর্গাপ্রসাদ তখনি পৈত্রিক গৃহ ত্যাগ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যে গৃহ একবার ত্যাগ করিয়াছেন তাহা হইতে আর কিছু গ্রহণ করিতে নাই।

কয়েক বৎসর পর বাড়ীর সকল লোক মিলিয়া নৌকা করিয়া ৺কাশীধাম দর্শন করিতে যান। তখনকার দিনে নৌকা করিয়া ৺কাশী যাওয়ার প্রথা ছিল। কারণ হাঁটাপথ অতি দুর্গম ছিল। এই যাত্রাতে শ্যামাসুন্দরী ও অল্পবয়স্ক বালক বিশ্বনাথ ও বাড়ীর অনেক মহিলাও ছিলেন। পথে যাইতে যাইতে নৌকাডুবি হয়। যে যার জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। শ্যামাসুন্দরী কিন্তু বালক পুত্র বিশ্বনাথের হাত ধরিয়া গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূর চলিয়া যান। সকলে উঠিলে মাতা ও পুত্রের অন্বেষণ হইল। কিন্তু দুজনকেই পাওয়া গেল না। তখন সকলে চারিদিকে নানা উপায়ে গঙ্গায় খুঁজিতে লাগিল। এমন সময় শ্যামাসুন্দরীর মুক্ত কেশ ভাসিয়া যাইতেছে দেখিতে পাওয়া গেল। সেই কেশ ধরিয়া অজ্ঞান অবস্থায় শ্যামাসুন্দরীকে টানিয়া তুলিলে দেখিতে পাওয়া গেল তাঁহার হস্ত দৃঢ়মুষ্টিতে পুত্রের হাত ধরিয়া আছে। শিশু বিশ্বনাথকেও পাওয়া গেল। অবশেষে নানা উপায়ে উভয়ের প্রাণ বাঁচান হইল।

কিছুদিন পরে সকলে ৺কাশীধামে গিয়া পৌঁছিলেন। একদিন দুর্গাপ্রসাদ দত্তের এক ভগিনী ও বংশের একটি বিধবা রমণী হাঁটিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে যাইতেছেন।

বেলা অধিক হইয়াছে। গরম পাথরে শুধুপায়ে চলা অভ্যাস নাই, অল্পবয়স্কা রমণীটি পায়ে হোঁচট লাগিয়া পড়িয়া যায়। পিছন হইতে হঠাৎ এক সাধু বলিয়া উঠিলেন, "এ মায়ি, গির গিয়া ?" কিন্তু দুর্গাপ্রসাদের ভগ্নী যদিও বহু বৎসর ভ্রাতাকে দেখেন নাই এবং তাঁহার ভাষা হিন্দি ছিল, তথাপি কানে ঠিক স্বর ধরিতে পারিলেন। তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন, "কে ও, দুর্গাপ্রসাদ ?" তখনই সাধুটি গালি দিয়া বলিলেন, "এখানেও তোরা বিরক্ত করতে এসেছিস ?" এই বলিয়া একদিকে চলিয়া গেলেন।

একজন সম্পর্কীয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সেইসময় কাশীবাস করিতেন। তিনি কখনও কখনও বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে দুর্গা-প্রসাদকে দেখিতে পাইতেন কিন্তু কথাবার্তা হইত না। এই সকল উপাখ্যান হইতে বুঝা যায় যে, দুর্গাপ্রসাদ অতি কঠোর সাধু ছিলেন। তাঁহার ভিতর ত্যাগ বৈরাগ্যের ভাব প্রবল ছিল, কারণ তিনি পূর্বাশ্রমের কোন সম্পর্ক রাখিতেন না।

প্রমাতামহী বা ঝি-মার কথা

এইস্থানে প্রমাতামহীর কথা কিছু বলা আবশ্যক এবং রামচন্দ্র দত্তের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক ছিল তাহাও কিছু বলা হইতেছে। কুঞ্জবিহারী দত্ত বা কুঁচিল দত্ত নারিকেলডাঙ্গায় বাস করিতেন। তাঁহার প্রথমা কন্যা রাইমণি, দ্বিতীয়া কন্যা গোকুলমণি এবং এক পুত্র নৃসিংহ প্রসাদ দত্ত। রাইমণির

বিবাহ হয় ঘোষেদের বাড়ী, বর্তমান মনোমোহন থিয়েটারের পশ্চিমে এবং গোকুলমণির বোসপাড়ার শ্যামাচরণ বসুর সহিত বিবাহ হয়। রাইমণির একমাত্র কন্যা রঘুমণি। রঘুমণির বিবাহ হয় রামতনু বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল বসুর সহিত এবং তাঁহার একমাত্র কন্যা ভুবনেশ্বরী, স্বামিজীর মাতা। নৃসিংহ-প্রসাদ দত্তের তিন পুত্র ও দুই কন্যা হইয়াছিল এবং রামচন্দ্র দত্ত বয়সপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নারিকেলডাঙ্গার বাড়ী যাইবার পর নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত ও রামচন্দ্র দত্ত বিশ্বনাথ দত্তের বাড়ীতে কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। পূজনীয়া ভুবনেশ্বরী যদিও রামচন্দ্রের সম্পর্কে ভাগিনী হইতেন কিন্তু শৈশব হইতেই তাঁহাকে স্তন্যপান করাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি সন্তানদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতেন এবং বাল্যকালে আমরা জানিতাম্ যে, রামচন্দ্র দত্ত বা রামদাদা আমাদের বড় ভাই। অপর যে কোন সম্পর্ক ছিল তাহা আমরা জানিতাম না।

এই বিষয়গুলি যদিও এখন কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইতেছে কিন্তু বংশের ভাবটি দেখানই উদ্দেশ্য এবং কাহার সহিত কিরূপ সম্পর্ক পরে অনবরত সেইগুলি আসিবে, সেইজন্য পূর্ব হইতে কিছু বলা হইল। শুষ্ক নিরস জীবনী লেখা এস্থলে উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু জীবনীর সহিত সমাজের অনেক সম্পর্ক থাকে, সেইগুলি না দেখাইলে বর্ণিত ব্যক্তির জীবনের উৎকর্ষ দেখান যায় না। সমসাময়িক আচার এবং সমাজের অবস্থা জানা আবশ্যক, এইজন্য এই সকল কথা এস্থলে বলা হইল।

মাতামহীর কথা

আমাদের মাতামহী রঘুমণিরও পুরাণের জ্ঞান ঝি-মার মত ছিল। যখন তিনি অতি বৃদ্ধা হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার ৮০।৮৫ বৎসর বয়স তখনও তিনি সকালে আহ্নিক পূজার পর আলোতে একখানি বই লইয়া বসিয়া থাকিতেন এবং সেই বইখানি স্থির মনে পড়িতেন। দুপুরে একবার খাইয়া লইয়া আবার বই লইয়া বসিতেন এবং সূর্য অস্ত যাইলে তিনি নিবৃত্ত হইতেন। একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তিনি বইতে কি পড়িতেছেন। উত্তরে তিনি বই-এর বিষয় ঠিক বলিলেন। বই পড়া শেষ হইলে দিদিমা অনবরত জপ করিতেন।

বিশ্বনাথ

বিশ্বনাথের যখন ১২ বৎসর বয়স তখন তাঁহার মাতা শ্যামাসুন্দরী বিসূচিকা (কলেরা) রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। তদবধি আজীবনকালই বিশ্বনাথ খুড়োখুড়ির কাছে মানুষ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে পিতামাতা বলিয়া জানিতেন।

বিশ্বনাথ ১৭।১৮ বৎসর বয়সে শিমুলিয়া পল্লীর রামতনু বসুর গলি নিবাসী নন্দলাল বসুর দুহিতা ভুবনেশ্বরীকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের প্রথমে এক পুত্র হইয়া মারা যায়। তাহার পর এক কন্যা হইয়া মারা যায়। তাহার পর এক কন্যা

হারামণি জীবিত থাকেন, তাহার পর পুনরায় কন্যা হয়, তিনি ১৩৩২ সন পর্যন্ত জীবিত থাকেন। তাহার পর এক কন্যা হইয়া মারা যায়। এইরূপে বিশ্বনাথের কয়েকটি কন্যা হইল কিন্তু পুত্র হইল না। সকলের উপদেশ অনুযায়ী একটি বৃদ্ধা আত্মীয়া কাশীবাস করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত হইল তিনি সোমবার বীরেশ্বরের পূজা করিবেন এবং মাতা ভুবনেশ্বরী সোমবারের ব্রত পালন করিবেন। এইরূপে এক বৎসর ব্রত পালন করিলে একটি পুত্র জন্মলাভ করে। বীরেশ্বরের আরাধনায় পুত্র হইয়াছিল এইজন্য সন্তানের নাম 'বীরেশ্বর' হইল। তাহার অপভ্রংশ হইয়া 'বিলে' হইল, কিন্তু পরে সাধারণ নাম 'নরেন্দ্র' হইল। বিশ্বনাথের তাহার পর দুই কন্যা কিরণবালা ও যোগেন্দ্রবালা এবং তাহার পর দুই সন্তান মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ হইল।

বীরেশ্বরের জন্মকথা

পৌষমাসে মকর সংক্রান্তি অর্থাৎ গঙ্গাপূজার দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে বীরেশ্বর বা নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়, ইংরাজী সন ১৮৬৩। সূতিকাগৃহে দুর্গাপ্রসাদের একটি ভগ্নী উপস্থিত ছিলেন। সদ্য-প্রসূত সন্তানটিকে দেখিয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিলেন, "এ যে ঠিক সেই দুর্গাপ্রসাদ। মায়া কাটাতে পারেনি তাই আবার নাতি হয়ে জন্মেছে।" কারণ সদ্যপ্রসূত শিশুর আকৃতি ও অবয়ব পিতামহ দুর্গাপ্রসাদের সহিত খুব সৌসাদৃশ্য ছিল।

ঢুলিবিদায়

তখনকার দিনে প্রথা ছিল সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই ঢুলিরা আসিয়া বাজনা বাজাইত এবং তাহাদিগকে পুরাণো কাপড় এবং কিছু পয়সা দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হইত। অনেককাল পরে বিশ্বনাথের পুত্রসন্তান হইল এইজন্য পাড়ার ডোমেরা খুব ঢোল বাজাইয়া গান গাহিতে লাগিল—

রাণী তোর ভাগ্য ভাল,
পেয়েছিস্ তোর নীলরতনে।
ইত্যাদি।

বিশ্বনাথ একে একে সকলকে টাকা পয়সা ও পুরাতন কাপড় দিয়া সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ঢুলির সংখ্যা বাড়িতে লাগিল ও কাপড়ের সংখ্যা কমিতে লাগিল। অবশেষে বিশ্বনাথ মেয়েদের পাছাপাড়ের ছোট একখানি কাপড় পরিয়া এবং পরিধেয় বস্ত্র ঢুলিদের দিয়া বৈঠকখানা হইতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া আসিলেন। তিনি এই উপলক্ষ্যে আহ্লাদে মুক্তহস্তে অনেক দান করিয়াছিলেন।

অন্নপ্রাশন

যথাসময়ে বীরেশ্বরের অন্নপ্রাশন হইল। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ঘটাঘটি হয় নাই, সাধারণভাবেই হইয়াছিল। ক্রমে শিশু বালকটি হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করিল। একদিন পাড়ার একটি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী, শিমুলিয়ার সুপরিচিতা শিবি ঘটকী,

বৈকালে আসিল। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ভিতর বাড়ীর উপরকার দালানে শিশুটিকে হামাগুড়ি দিতে দেখিয়া অনেকক্ষণ স্থির হইয়া নিরীক্ষণ করিল। অবশেষে বলিল, "বিশুবাবুর এই ছেলেটি দেব অংশের। হাত পায়ের গড়ন, চালচলন সবই যেন দেবতার মত। ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে দেবতাদের মতন কাজ করিবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী শিশুটিকে কোলে লইয়া অনেক আদর করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকস্থলভ ভাষায় সে তাহার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল।

শৈশবে

একটু বড় হইলে যখন হাঁটিতে পারিত, শিশুটি এক এক সময়ে ভারি দুরন্তপনা করিত। তখন তাহাকে সামলান বড় দায় হইত। বীরেশ্বরের মাতা পূজনীয়া ভুবনেশ্বরী ঘটি করিয়া পাতকুয়ার এক ঘটি জল আনিয়া শিশুটির মাথায় ঢালিয়া দিতেন এবং শিব শিব শিব বলিয়া জপ করিতেন। তখন শিশুটি শান্ত হইয়া বসিয়া পড়িত এবং চোখ বুজিয়া থাকিত। মাতা ভুবনেশ্বরী রাগিয়া বলিতেন, "পাগ্‌লা শিবের পূজো ক'রে ছেলে পেলুম না কি একটা পাগ্‌লা ভূত, তা না হ'লে ছেলেটা এমন পাগলাটে ধাতের হোলো কেন?" এইরূপ বলিয়া তিনি অনেক ভর্ৎসনা করিতেন।

অতি শৈশবে বীরেশ্বরের খেলিবার প্রিয় জিনিস ছিল একটি শুকনো থেলো হুকো। সেইটি সে সব সময় হাতে লইয়া

বেড়াইত এবং মাঝে মাঝে হুকোর খোলে যেখানে সেখানে মুখ দিয়া চুষিত। এই ছিল তাহার বড় আমোদের খেলা।

বিশ্বনাথ বিভবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হাইকোর্টের এটর্ণি ছিলেন। তাঁহার গাড়ী ঘোড়া ছিল। হিন্দু কোচোয়ান ও হিন্দু সহিস ছিল। সেই হিন্দু কোচোয়ানটি বীরেশ্বরকে সব সময় কোলে লইয়া বেড়াইত। এইজন্য সেই কোচোয়ানের বড় নেওটো হইয়াছিল। সে কখনও বা শিশুবালকটিকে লইয়া ঘোড়ার পিঠে বসাইয়া দিত এবং সেই শুকনো হুকোটাতে খালি কলকে বসাইয়া দিয়া বলিত, "বিলুবাবু, হুক্কা পিও।" বীরেশ্বর যখন স্বামী বিবেকানন্দ হইয়াছিলেন তখনও তিনি সেই কোচোয়ানের অনেক গল্প বলিতেন এবং ছেলেবেলায় যে সেই কোচোয়ানকে ভালবাসিতেন সেই কথা অনেকবার বলিয়াছিলেন।

পাঠশালা

তখনকার দিনে এত স্কুলের প্রচলন ছিল না। হাতে খড়ি হইবার পর পাঠশালায় যাইতে হইত। পাড়ায় যদিও একটি পাঠশালা ছিল কিন্তু সেখানে নানাপ্রকার ছেলে যায় ও অসৎসঙ্গ হয়, সেইজন্য বীরেশ্বরের যখন ৫।৬ বৎসর বয়স হইল তখন তাঁহার পিতা অধ্যয়নের জন্য বাড়ীর ঠাকুর দালানে এক গুরুমহাশয় আনাইয়া পাঠশালা বসাইয়া দিলেন। বাড়ীর ছোট ছেলেরা এবং পাড়ার অনেক ছেলেরা সেই পাঠশালায় পড়িতে আসিত। ক্রমেই পাঠশালা খুব জমিয়া

উঠিল এবং প্রায় পঞ্চাশ ষাটটি ছেলে হইল। বীরেশ্বর যদিও বয়সে অনেকের অপেক্ষা ছোট ছিল কিন্তু অল্পদিনের ভিতর বেশ লিখিতে পড়িতে শিখিল এবং অনেকের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বালক বলিয়া পরিগণিত হইল। আগন্তুক অনেক লোককেই গুরুমহাশয় নিজের ছাত্রের কৃতিত্ব দেখাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন এবং পারিতোষিকও বিশেষ পাইতেন।

গঙ্গার বন্দনা

তখনকার দিনে পাঠশালায় মকর সংক্রান্তির দিন গঙ্গাবন্দনা গাহিয়া গঙ্গায় পূজা করিয়া আসার প্রথা ছিল। মকর সংক্রান্তির দিনে অর্থাৎ পৌষমাসের ৩০শে পিতা বিশ্বনাথ নূতন কাপড় জামা ইত্যাদি গুরুমহাশয়কে এবং কয়েকজন ছাত্রকে দিতেন এবং তাঁহাদের বাজনাবাদ্য সহ গঙ্গাপূজা করিয়া আসিতে অনুমতি দিতেন। গুরুমহাশয় আনন্দে দলবল লইয়া গাঁদা ফুলের মালা, নিশান এবং বাদ্যকর লইয়া গঙ্গায় পূজা করিয়া আসিতেন। সকলে ফিরিয়া আসিলে পিতা বিশ্বনাথ সকলকে রীতিমত মিষ্টিমুখ করাইতেন। সেইদিন ছাত্রদিগের ভিতর মহা আনন্দ-উৎসব হইত। কিন্তু বিশেষ এক বক্তব্য সকল বালক মিলিত হইয়া সুর করিয়া গাহিত—

বন্দেমাতা সুরধুনী,
পুরাণে মহিমা শুনি।
ইত্যাদি

কিন্তু বীরেশ্বরের স্বাভাবিক কণ্ঠের মিষ্টতা বিশেষভাবে সকলের লক্ষ্য হইয়াছিল এবং শব্দগুলি অতি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বালক যে সুকণ্ঠ এবং তাহার সঙ্গীতের যে শক্তি ছিল তাহা সেইদিনই প্রকাশ পাইয়াছিল।

দুই আড়াই বৎসরের ভিতর গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যাহা পড়া আবশ্যক, সকলই সমাপ্ত হইল। তখনকার দিনে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পড়ুয়াদিগকে গুরুমহাশয়ের জন্য তামাক এবং একটি করিয়া সিধা আনিতে হইত এবং একটি করিয়া পয়সা দিতে হইত। গুরুমহাশয় বালকদিগকে এর-তার বাগান থেকে চুরি করিতে উপদেশ দিতেন এবং তাহার অন্যথা হইলে বিশেষভাবে বেত্রাঘাত করিতেন। তখন হাতছড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া একপায় দাঁড়ান, নাড়ু গোপাল প্রভৃতি অনেক প্রকার দণ্ডের প্রথা ছিল। কখনও দুইহাতে দুইখানি ইঁট দিয়া দুইহাত বিস্তার করিয়া এক পা বা দুই পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। কখনও বা দুইখানি ইঁটের উপর দুই পা বহুদূরে পৃথক করিয়া সম্মুখে সেইরূপ দুই ইঁটের উপর হাত দিয়া পিঠটা ধনুকের মত করিয়া রাখিত এবং পিঠে একখানি ইঁট দিত। পিঠের ইঁট পড়িয়া যাইলে গুরুমহাশয় নূতনভাবে বেত্রাঘাত করিতেন। এইরূপ দণ্ডের নানাবিধ উপায় গুরু-মহাশয় উদ্ভাবন করিতে পারিতেন। কথায় বলিত, "দারগা ও গুরুমশাই দুই ভাই, যমের দুই পুত্র।" গুরুমহাশয়রা

প্রায় বর্ধমান জেলার লোক হইতেন এবং ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ হইতেন। তঁহাদের উচ্চারণ গ্রাম্য ছিল। যথা ক-ল্যাখঅ, খ-ল্যাখঅ, স্ক—আস্ক, স্থ—আস্থ, স্প—আস্প, হ্ন—অহন্ন ইত্যাদি। তাহার পর নামতা পড়ান ছিল—এক কড়ায় পোয়া গণ্ডা, দুই কড়ায় আধ গণ্ডা, তিন কড়ায় পৌনে এক গণ্ডা, কিন্তু চার কড়ায় আর উঠিত না। গুরুমহাশয়দের মুখে সদাই কটুবাক্য ও হাতে বেত। সজোরে বেত না মারিলে গুরু-মহাশয়ের হৃদয়স্থিত বিদ্যাশক্তি ছাত্রদিগের ভিতর প্রবেশ করে না, এইজন্য ইঁহারা ছাত্রদিগকে নির্দয়ভাবে প্রহার করিতেন। যতপ্রকার কটুকাটব্য ভাষা আছে, গুরুমহাশয় তাহা সর্বদা ব্যবহার করিতেন এবং পড়ুয়ারাও তাহাতে নিপুণ হইত। তাহার পর সর্দার-পড়ো বলিয়া দুইজন হইত। কোন পড়ুয়া একদিন না আসিলে সর্দার-পড়ো ফরেষ্টের পেয়াদার মত চাং দোলা করিয়া অর্থাৎ হাত পা ধরিয়া আনিত। পাঠশালা ঘরে আসিলে গুরুমহাশয় তাহাকে নাড়ুগোপাল বা অন্য কোন দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু পিতা বিশ্বনাথ গুরুমহাশয়কে উপদেশ দিয়াছিলেন যেন এরূপ কোন ব্যবহার না করা হয়। তবে রবিবারের সিধা তাঁহার প্রাপ্য সুতরাং তাহা নিবারণ করা যাইতে পারে না। সেইজন্য সেই প্রথা চলিত কিন্তু তামাক আনা বন্ধ হইয়াছিল।

পাঠশালা দুইবার বসিত, সকালে ও বৈকালে। সকালে পাঠ সাঙ্গ হইলে সব ছাত্রেরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া

নামতা, কড়াকিয়া, সট্‌কে আবৃত্তি করিত। একজন ছাত্র পৃথক দাঁড়াইয়া নিজে মুখস্থ বলিত এবং অপর ছাত্রেরা সমস্বরে তাহা উচ্চারণ করিত। বৈকালবেলায় পড়া সমাপ্ত হইলে সমস্ত ছাত্রেরা একসঙ্গে সরস্বতীর বন্দনা করিত। তখনকার দিনে শ্লেট বা কাগজের প্রচলন ছিল না। লম্বা লম্বা তালপাতায় খাঁকের কলম দিয়ে বাংলা কালিতে লিখিতে হইত। দোয়াতের ভিতর একটু ছেঁড়া ন্যাকড়া থাকিত, তাহাকে 'নেত্তি' বলিত। তালপাতায় লেখা হইলে একখানি ভিজা নেত্তি দিয়া মুছিয়া ফেলা হইত। তাহার পর তালপাতাগুলি গুছাইয়া একটি দড়িতে বাঁধিয়া ছোট মাতুরের সহিত গুটাইয়া বাঁ বগলে লওয়া হইত এবং দোয়াতের গলায় একটি দড়ি বাঁধা থাকিত। নেত্তিওয়ালা বাংলা কালিসংযুক্ত দোয়াত হাতে ঝুলাইয়া আনিতে হইত। হাতে কালি এবং মুখে কালি খুবই হইত। এইজন্য লোকে উপহাস করিয়া বলিত,—

"হাতে কালি
মুখে কালি
বাছা আমার লিখে এলি।"

তখন জামা জুতার প্রচলন ছিল না। গরমকালে শুধু গায়ে খালিপায়ে পাঠশালায় যাওয়া হইত। শীতকালে সঙ্গতিপন্ন লোকের ছেলেরা লক্ষ্ণৌ ছিটের দোলাই গায়ে জড়াইত এবং পিছনে খুঁটগুলোতে একটি গেঁট বাঁধিয়া দিত। তাহাতে লেখার অসুবিধা হইত না। গুরুমহাশয় মাঝে মাঝে নূতন

পাঠ বা দাগা দিতেন। সেদিন একটু কাগজ সংগ্রহ করিতে হইত এবং গুরুমহাশয় তাহাতে কড়াঙ্কে বা শট্‌কে লিখিয়া দিতেন। পড়ুয়া তাহা দেখিয়া লিখিত। ইহাকে বলে 'দাগা' বুলান। সেদিন গুরুমহাশয় প্রণামী হিসাবে কিছু পাইতেন। পাঠশালার চরম বিদ্যা হইল, দাতাকর্ণ এবং গঙ্গার বন্দনা মুখস্থ বলা এবং 'সেবক শ্রী' লেখা, 'প্রণাম পুরঃসর' ইত্যাদি নানারকম কিরূপ লিখিতে হয় এবং 'তমস্সুক' অর্থাৎ ঋণ কর্জের লেখাপড়া কি রকম হয় তাহা শিক্ষা করা। এখন অনেকে 'সেবক শ্রী' শুনিলে হাসিবে, কিন্তু তখন এই ছিল শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এইজন্য দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদ বলিতেছেন,—

"তোর বাপ পড়েছে দাতাকর্ণ, তুই পড়বি বোধদয়।"

অর্থাৎ পাঠশালার বিদ্যা এই পর্যন্ত হইত। কিন্তু পিতা বিশ্বনাথ দত্ত নিজের বাটীতে পাঠশালা রাখায় গুরুমশায়কে অত্যাচার বা বাড়াবাড়ি করিতে দেন নাই। গুরুমশায়কে অনেকটা ভদ্রভাবে থাকিতে হইয়াছিল, অবশ্য গুরুমহাশয়ের শ্রেণীর মধ্যে। তখন এত স্কুলের প্রথা ছিল না। স্কুল সবে সুরু হইতেছে। এইজন্য গরীব ও নিম্নশ্রেণীর ছেলেরা পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া যে যার দোকানে কাজ করিত এবং কেবল ভদ্রলোকের ছেলেরা স্কুলে যাইতে পারিত। বীরেশ্বর দুই বা আড়াই বৎসরের ভিতর গুরুমহাশয়ের নিকট বেশ শিখিয়া লইল এবং অতি সরলভাবে বাংলা বই পড়িতে

পারিত। পরে বীরেশ্বর বিদ্যাসাগরের স্কুলে ভর্তি হওয়ায় পাঠশালার আর আবশ্যক রহিল না। পাঠশালা উঠিয়া গেল।

রামায়ণ পড়া

বীরেশ্বর যদিও পাঠশালায় অনেকের অপেক্ষায় বয়সে ছোট ছিল (বয়স ৫ হইতে ৬ বৎসর), কিন্তু বাংলা পড়িতে অল্পদিনে বেশ শিখিল। বালকের কণ্ঠ স্বাভাবিক সুললিত ছিল। বাড়ীর কর্তা কালীপ্রসাদ দত্ত মাঝে মাঝে বালক বীরেশ্বরকে রামারণ পড়িতে আদেশ করিতেন। আগেকার দিনে গুরুমহাশয় বা মুদির দোকানে যেমন সুর করিয়া নাকি-সুরে পড়িত, বীরেশ্বরও গুরুমহাশয়ের কাছে সেইরূপ পড়িতে শিখিয়াছিল। বালকের মুখে সেই সুর শুনিতে অতীব মধুর হইত। ইহাকে চলিত কথায় 'পাঁচালীর সুর' বলে। খুল্লপিতামহ কালীপ্রসাদ দত্ত প্রথমে একদিন বালকদিগকে ডাকিয়া রামায়ণ পড়িতে বলিলেন। বীরেশ্বর অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ কেহ পড়িতে সাহস করিল না এবং এবং দুই একজন যাহারা পড়িতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা অস্পষ্ট করিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে বীরেশ্বর বয়সে যদিও কনিষ্ঠ, কৃত্তিবাসের রামায়ণখানি হাঁটুর উপর রাখিয়া বই খুলিয়া প্রচলিত নাকি-সুরে পড়িতে লাগিল,—

"অরুণে লইয়া স্কন্ধে বিনতানন্দন"

ইত্যাদি।

বালকের মুখে পয়ারের ছন্দে নাকি-সুরে পড়িতে শুনিয়া বীরেশ্বরের মাতা ভুবনেশ্বরী অতি শীঘ্র তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার মেধা অতি তীক্ষ্ণ ছিল, এইজন্য মাতা ভুবনেশ্বরী সেই উচ্চারিত শ্লোকগুলি নিজে আয়ত্ত করিয়া লইলেন এবং বহু বৎসর পরে এই উপাখ্যান বলিতেন। তাহাতে যে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যাহাহউক, বাড়ীর কর্তা কালীপ্রসাদ দত্তকে বীরেশ্বর প্রায় সমস্ত বাংলা রামায়ণখানি পড়িয়া শুনাইয়াছিল। বীরেশ্বরের প্রতিভার ও বিদ্যাবত্তার এই প্রথম পরিচয়। কারণ, বলিবামাত্রই ছোট ছেলেটি বইখানি খুলিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সুর করিয়া পড়িতে লাগিল, যেন কত প্রবীণ লোক এবং কতই যেন অভ্যস্ত আছে। কোন দ্বিধা নাই, কোন সংকোচ নাই, দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া সে বেশ পড়িতে লাগিল। সে প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া এই রামায়ণ পড়িত।

মাথায় কাটা দাগ

বালক বীরেশ্বরের বয়স যেমন বাড়িতে লাগিল, দুরন্তগিরিও তেমনি বাড়িতে লাগিল। সে কখনও স্থির হইয়া থাকিতে পারিত না, সব সময় ছটফট করিত—কিছু না কিছু যেন তাহাকে করিতে হইবে। একদিন বিকালবেলায় সকল ছেলে ছোটাছুটি করিতেছে এবং ঠাকুরদালানের রক থেকে লাফ

মারিতেছে। ঠাকুরদালানের রক উঠান হইতে এক মানুষ উঁচু ছিল, দুইটি পৈঠা দিয়া উঠিতে হইত। হুড়োহুড়ি করিতে করিতে বীরেশ্বর রক হইতে বেকায়দায় পড়িয়া যায় এবং উঠানের একটি খোলাম কুচি বা ঢিল তাহার কপালে ফুটিয়া যায়। কপালটি কাটিয়া গিয়া গলগল করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল এবং অনেকটা চিরিয়া গিয়াছিল। পরে যদিও ঘা শুকাইয়া গিয়াছিল কিন্তু কাটা দাগ চিরকাল ছিল।

প্রেমানন্দ স্বামী (বাবুরাম মহারাজ) কোন ছোট ছেলে তাঁহার কাছে আসিলে আগে সেই ছেলেটির কপাল নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত। যদি কপালে কাটা দাগ থাকিত তো বাবুরাম মহারাজ বড় খুশী হইত। তাহার কথা ছিল যে স্বামিজীর কপালে কাটা দাগ ছিল, সেইজন্য তিনি বড়লোক হইয়াছিলেন। যে ছেলের কপালে কাটা দাগ আছে, সে বড় লোক হইবে। কথাটির কিছু অর্থ আছে, বালক যদি শক্তিমান হয় তাহা হইলে স্বভাবতঃই চঞ্চল হইয়া থাকে, এবং তাহার গায়ে, পায়ে, মাথায় কাটা দাগ হইবেই হইবে এবং সেই ছেলেগুলি বড় হইয়া বিখ্যাত লোক হয়। যে ছেলেগুলি বোকা হয়, সেগুলির গায়ে বড় কাটা দাগ থাকে না। তাহারা জগতে বিশেষ কিছু করিতে পারে না। ইহা সাধারণ নিয়ম।

কপাটি খেলা

তখন কপাটি খেলার খুব প্রচলন ছিল। বাহিরের উঠানটি

খুব বড়। ছুটাছুটি করিবার খুব সুবিধা। বাড়ীতেও জ্ঞাতি-গোষ্ঠি লইয়া বালকের সংখ্যা ১০।১৫টির উপর এবং পাড়ার ছেলেরাও সব আসিত। বাহিরের উঠানে কপাটি খেলা খুব জমিত। তখন বাড়ীতে অনেকগুলি গরু ছিল। বিচালির আঁটি হইতে খড় আনিয়া একটি দাগ করা হইত। এবং দুই দলে ছেলেরা দাঁড়াইয়া,—

"চুরে রাং ঠ্যাং,
সোণা দিয়ে বাঁধাবো ঠ্যাং।
মারবো ঠ্যাঙ্গের বাড়ি,
পাঠাবো যমের বাড়ী॥"

এইসব ছড়া আওড়াতে আওড়াতে কপাটি খেলা হইত এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে মোর করিয়া দেওয়া হইত। কখনও বা মুখ বন্ধ করিয়া 'আম্বা', 'আম্বা' করিয়া ছড়া না আওড়াইয়া ছুঁইয়া দিতে যাওয়া হইত। কপাটির নানা কৌশল, নানা প্যাঁচ ও ল্যাং মারা খুব চলিত।

খেলায় যদিও বাড়ীর ও পাড়ার ছেলে লইয়া ২০।২৫টি হইত, কিন্তু বীরেশ্বরের বিশেষত্ব ছিল যে সে দলপতি বা সর্দার হইত। মোর করা বা ছুঁইয়া দেওয়াতে যদি খেলার কোন বে-আইনি হইত, বীরেশ্বর যাইয়া তাহার ন্যায় বা অন্যায় মীমাংসা করিয়া দিত। এইজন্য বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীন দর্শকেরা যাঁহারা ঠাকুরদালানে বা রোয়াকে দাঁড়াইয়া তামাক খাইতেন তাঁহারা প্রায় বলিতেন, "বিলের মুরুব্বি করা অভ্যাস, মুরুব্বিগিরি

করতে না পারলে থাকতে পারে না।” এই খেলার ভিতর দেখা যাইত যে বীরেশ্বর বা বিলে সকলের সর্দার বা মোড়ল হয়ে ফোঁপর দালালি করিত। সে খেলায় যেন প্রাণস্বরূপ থাকিত ও সকলকে উৎসাহিত করিত। কখনও ছোঁ মারিতে ব্যক্তিবিশেষকে আদেশ করিত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আশঙ্কচিত্তে বিলের আদেশ পালন করিত। তাহার এই নেতৃত্বভাব পরে বর্ধিত হইয়াছিল এবং আমেরিকা ও ইংলণ্ডেই ইহা পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ পাইয়াছিল। কারণ, স্বামিজী আমাদের দেশ বা আমাদের লোক এরূপ শব্দ ব্যবহার করিতেন না। তিনি যেন স্বয়ং নির্দেষ্টা বা ডিক্টেটর হইয়া ‘My country’, ‘My Hindus’, ‘My people, এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিতেন। শিশু বিলে পরে ধীরে ধীরে নির্দেষ্টা বিবেকানন্দে পরিবর্ধিত হইয়াছিল।

মারবেল খেলা

তখনকার দিনে বালকেরা খুব মারবেল খেলিত। এ খেলাটির খুব রেওয়াজ ছিল। গাব্বু পিল, ঘরপার, চিক্ বেগদা প্রভৃতি খেলা ছিল। বীরেশ্বর যদিও অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতি অর্থাৎ বংশ হিসাবে কিছু খর্বাকৃতি ছিল কিন্তু গাব্বু পিল ও ঘরপার খেলাতে খুব টিপ মারিতে পারিত এবং মারবেল জিতিয়া লইত। কিন্তু ছেলেরা যাহারা হারিয়া যাইত, তাহারা খেলার শেষে কান্না ধরিত আর বলিত, “ভাই বিলে,

তুই ভুগিয়ে আমাদের মারবেল জিতে নিয়েছিস্, তুই আমাদের মারবেল দে।” বীরেশ্বর বা বিলে যদিও ন্যায়তঃ মারবেল জিতিয়া লইয়াছিল কিন্তু বালকদের কাকুতি মিনতিতে সব ফিরাইয়া দিত। সে এক একদিন প্রায় ৩০।৪০টি মারবেল জিতিত। নরেন্দ্রনাথ ১৮৮৩।১৮৮৪ সালে যখন বি, এ, পাশ করিয়া পিতা বিশ্বনাথ ও খুল্লতাত তারকনাথের সহিত হাইকোর্টে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছেন তখন একদিন রবিবার সকালে ১০।১০॥টার সময় বালকেরা উঠানে মারবেল খেলিতেছিল। নরেন্দ্রনাথ একজনের কাছ থেকে মারবেল চাহিয়া লইয়া বলিল, “দেখ্ আমার হাতের টিপ দেখবি।” এই বলিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গাব্ব্ পিল খেলিতে লাগিল এবং গাব্ব্ থেকে মারিয়া ঠিক মারবেল তুলিতে লাগিল। তাহার পর খানিকক্ষণ ঘরপার খেলিল। অনেকে বসিয়া মারে, কিন্তু বীরেশ্বর দাঁড়াইয়া মারিতে লাগিল। তখনও তাহার হাতের টিপ বেশ ছিল। সাথীরা কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, “ভাই বিলে, তুই কি ক’রে টিপ মারিস ?” সে বলিত, “মারবেলের সঙ্গে, হাতের সঙ্গে, চোখের সঙ্গে এক করে নিতে হয়, তারপর টিপ মারলে ঠিক লেগে যাবে।”

আমেরিকায় যাইবার পূর্বে সাধুভাবে যখন স্বামিজী মাদ্রাজে গিয়াছিলেন সেই সময়ে কিডি* একটি গল্প বলিয়াছিল—স্বামিজী

* ইনি স্বামিজীর অন্তরঙ্গ শিষ্য। ইঁহার ভাল নাম, পি, সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়ার।

শুনিলেন জনকয়েক লোক হরিণ শিকার করিতে যাইতেছেন। স্বামিজীর খেয়াল হইল তিনিও শিকারে যাইবেন। অপরে ভাবিল—গেরুয়াধারী শিকারে যাইবে, এ আবার কি? তখন স্বামিজী দু'এক ধমক দিতে সব চুপ। শিকারে যাইয়া স্বামিজী একটা হরিণের উপর টিপ করিলেন, তারপর ঘোড়াটা টানিলেন। গুলিটা ঠিক হরিণের গায়ে গিয়া লাগিল। কিডি বলিবার সময় উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল, "Swamiji is a dead shot"; "Swamiji is a dead shot." স্বামিজী সাংঘাতিক টিপ মারিতে পারেন। কথাটি খুব সত্য। স্বামিজী অনেক সময় বলিতেন, "মনটা একাগ্র করে যে কাজে লাগাবে, সেই কাজেই জিতবে।"

লাটিম খেলা

তখন লাটিম খেলা খুব হইত। লাটিমে লাটিমে গচ্চা মারা খেলা হইত। কিন্তু ওটা নিতান্ত নিস্তেজ খেলা বীরেশ্বর একটু একটু লাটিম খেলিত কিন্তু এ খেলাটি বিশেষ পছন্দ করিত না। কে জানে, যে ছেলেগুলি লাটিম খেলিতে তৈয়ারী হইয়াছিল সেগুলি জগতে অপদার্থ হইল, আর যাহারা লাটিম খেলা ঘৃণা করিত, তাহারা বড় হইল। এবিষয়ে এর সঙ্গে যে কি সম্পর্ক আছে তাহা বলা যায় না। বোধ হয় লাটিম খেলায় মস্তিষ্কের কোন চালনা হয় না, মস্তিষ্কটা জড় মরিয়া যায়।

ঘুড়িওড়ান

বাড়ীর ছেলেদের ঘুড়ি ওড়াইবার খেয়াল হইল। তাহারা সুতার কাটিম ও তাসা কিনিয়া বোতল-চুর ও খইয়ের মাড়ের মাঞ্জা দিতে লাগিল। সুতা একটি লাটাইয়ে জড়াইয়া ঘুড়ি ওড়ান আরম্ভ হইল। কিন্তু বীরেশ্বরের অপর অপর ছেলেদের ন্যায় ঘুড়ি ওড়াইতে তত উৎসাহ ছিল না, তবে ছোট ছেলে, সকলের সঙ্গে মিশিয়া তেতলার ছাদে বৈকালবেলায় যাইত এবং ঘুড়ি, সুতা ও মাঞ্জার হিসাব বাবদ দু'একটি পয়সা চাঁদা দিত। কিন্তু নিজে লাটাই ধরিয়া ঘুড়ি ওড়ান, লাট দেওয়া ইত্যাদি খেলার ইচ্ছা ছিল না। ঘুড়ি যখন খুব উপরে উঠিত তখন খানিকক্ষণ কখনও অপর ছেলেরা তাহার হাতে দিত। সেইটা দু'এক মিনিট ধরিয়া থাকিত। তাহার কপাটি, মারবেল খেলাতে যেমন উৎসাহ ছিল, ঘুড়ি ওড়ানতে তত উৎসাহ ছিল না।

এস্থলে তখনকার দিনের ঘুড়ির একটু বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালী পাড়ার লোকেরা পরস্পরে ঘুড়ির প্যাঁচ লড়াই করিত এবং তাহা দেখিতে রাস্তায় লোক দাঁড়াইয়া যাইত, অবশ্য তাহারা পোথো লোক। কখনও বাঙ্গালী পাড়ার সহিত মাণিকতলার মুসলমানদের সহিত ঘুড়ির প্যাঁচ লড়াই হইত। সে সকল লোকেরা বড় বড় রঙিন গামছা গায়ে দিয়া রাস্তায় ঘুড়ি উড়াইয়া খেলিত। কখনও কখনও দরমার মত বড় ঘুড়ি করিয়া উড়াইত এবং এক একটি লোক

এত নিষ্ঠুর ছিল যে তাহাতে একটা বিড়াল ছানা বাঁধিয়া দিত। আর এক রকম ঘুড়ি তখন মাঝে মাঝে উড়াইত। টোন দড়ি দিয়া ঘুড়িটিকে উড়াইয়া খুব উচুঁতে রাখিত। আর কলকব্জা করিয়া কাগজের বড় চিল তৈয়ারী করিয়া সেই চিলটি টোন দড়ি দিয়া ডানা মেলাইয়া উপরে ঐ ঘুড়ির কাছে পৌঁছিয়া দিত, তারপর আবার ডানা বন্ধ করিয়া সুরসুর করিয়া নামাইয়া আনিত। এরূপ তামাসার ঘুড়ি অনেক প্রকার ছিল। সময়ে সময়ে এত ঘুড়ি উড়িত যে আকাশটা যেন ছাইয়া যাইত। সেই সব কারণে যে সব বালকদের ঘুড়ি উড়াইবার ইচ্ছা থাকিত না, তাহারাও ছাতে উঠিয়া তামাসা দেখিত। ভালমন্দ যাহাই হউক না কেন, সে সময়ে এইরূপ প্রথা ছিল।

পায়রার কথা

শিমুলিয়ার পল্লীতে পায়রা উড়াইবার ভারী সখ। অনেক বাড়ীতেই উড়াইবার নানা রকমের 'গেরবাজ' পায়রা থাকিত। সে এক বেশ মজার ব্যাপার ছিল। কার্তিক মাস থেকে পায়রা উড়াইবার ধুম পড়িত। সকালবেলায় পায়রাকে আকাশে উড়াইয়া দিত। ঝাঁকঝাঁক পায়রা উড়িতে উড়িতে একেবারে বুঁদ হইয়া যাইত। কেবল একটু একটু ঝিকঝিক করিয়া দেখা যাইত। তাহারা হয়তো ১১।১২টার সময় নামিত আবার কখনও কখনও এরূপ হইত যে বৈকালে নামিত।

পায়রা উড়াইবার বাজি হইত এবং হারজিত খাওয়ানও ছিল। কোন কোন সময়ে পায়রা ছাড়া হইলে রাস্তার লোক দাঁড়াইয়া দেখিত এবং কাহার পায়রা কতদূর উড়িল, তাহা বিচার করিয়া হারজিত নির্ণয় করিয়া দিত। আবার শীতকালে পায়রাকে বাজ ও তুরমূর্তি ধরিত। পায়রাপালক পায়রার ঝাঁককে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য আঙ্গুল দুটি মুখের ভিতর দিয়া ফুঁ দিত, তাহাতে কানফাটা বিপর্যয় আওয়াজ হইত। এই ত গেল পায়রা উড়ানোর ব্যাপার। পায়রার ঔষধপত্র ডাক্তারি অন্য ব্যাপার ছিল। সমবয়সি একটি ছেলে কিছু বোকা, সে দুপুরে আসিয়া একজন পায়রা উড়াইবার সর্দারকে বলিত, "বড়বাবু, আমার পায়রার ব্যামো হয়েছে, একটা দ-ওয়াই ব'লে দিন দেখি।"

বীরেশ্বর সেই রকম বসা গলা করিয়া তাহার স্বর অনুকরণ করিয়া ভেংচাইত, "কি রে, একটা দ-ওয়াই চাই।" কিন্তু বীরেশ্বর নিজের হাতে পায়রা উড়াইত না। সে তিনতলার ছাদে পৈঠের উপর শুইয়া থাকিত, হাতে একখানি বই থাকিত, পড়িত আর পায়রার দিকে মাঝে মাঝে চাহিয়া তামাসা দেখিত। অবশ্য পায়রার দানার দরুণ ২।৪টা পয়সা তাহাকে দিতে হইত।

ময়ূর, ছাগল ও বানর

বিশ্বনাথ দত্তের তখন বিস্তর অর্থাগম হইতে লাগিল এবং জমিদারীও করিলেন। এইজন্য বীরেশ্বর কোন জিনিসের আবদার

করিলেই লোকজনে তখনই তাহা আনিয়া দিত। বীরেশ্বরের খেয়াল হইল ময়ূর, ছাগল, বানর ইত্যাদি পুষিবে। সে দিন-কতক সব জানোয়ারকে লইয়া নিজে খেলা করিয়া বেড়াইত এবং নিজে হাতে করিয়া খাওয়াইত। পরে ময়ূরটিকে পাড়ার একজন লোক ঢিল মারিয়া মারিয়া ফেলিল। বানরটি উৎপাত করিতে লাগিল, তাই সেটাকে বিদায় করা হইল। ছাগলটা ঠাকুর দালানের খিলানের নীচে কিছুদিন ছিল। এইরূপে বীরেশ্বরের জন্তু জানোয়ারের সখ ছেলেবেলায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

বেলুড় মঠ স্থাপন হইলে স্বামিজী অনেক জন্তু জানোয়ার পুষিয়া ছিলেন এবং নিজে দাঁড়াইয়া সব জানোয়ারদের খাবার খাওয়াইতেন। কতকগুলি চীনে রাজপাতিহাঁস একদিকে, ছাগল;ভেড়া একদিকে, পায়রা একদিকে এবং গরু একদিকে থাকিত। হাঁস, ছাগল, ভেড়াগুলি ছোট ছোট গামলা করিয়া খাবার দেওয়া হইত; গরুগুলিকে সুমুখে খাবার দেওয়া হইত, পায়রাদেরও সেইরূপ দানা দেওয়া হইত আর স্বামিজী এক কৌপীন পরিয়া একটা লম্বা লাঠিতে দাড়ি রাখিয়া সেই জন্তু জানোয়ারদের খাওয়া দেখিতেন। তাহার বাল্যকালের জন্তু জানোয়ার পোষার ইচ্ছাটা শেষকালেও প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। একজন স্বামিজীর ভক্ত একটা বড় সুন্দর কথা বলিতেন। তিনি বলিতেন, "শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বালকদের নিয়ে মাঠে গরু চরাতেন এবং তাতে যে কি আমোদ এত বুঝতে পারতুম না। কিন্তু যখন মঠেতে কোপনি মেরে লাঠিতে দাড়ি দিয়ে মাঠের মাঝে স্বামিজী

দাঁড়িয়ে তাঁর চারিদিকে জন্তু জানোয়ারদের খাওয়া দেখতেন, তখন বুঝলুম শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে রাখালভাব ধারণ করেছেন এবং তাতে কি আনন্দ আছে।”

জন্তু জানোয়ারগুলো ক্যাঁচম্যাচ করিত আর স্বামিজী চুপ করিয়া শুনিয়া বলিতেন,

“গাওয়ত জীব জন্তু আজি যে আছে যেখানে।”

এই যে ব্রহ্ম সঙ্গীত আছে, এ যদি সত্যিকারের হয়, তাহা হইলে ভগবান স্বর্গ ছাড়িয়া ছুট মারিয়া পালাইবে। গোটা-কতকের চীৎকারে কাণ ঝালাপালা হয়।

পায়রার সখটা স্বামিজী তাঁহার মাতামহবংশের বোসেদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। স্বামিজীর মাতা ভুবনেশ্বরীও পায়রা ভালবাসিতেন এবং সেইজন্যই বাড়ীতে বরাবরই পায়রা ছিল। অল্পবয়স্ক শিশু প্রবীণ হইয়া নানা কার্য করিয়া থাকে কিন্তু ভিতরটা দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে একটা রেখা বরাবর চলিতে চলিতে সরু হইতে মোটা হইয়া উঠে।

কোচোয়ানের সহিত গল্প

বুড়ো কোচোয়ান বালক বীরেশ্বরকে আস্তাবলে তাহার খাটিয়ায় বসাইয়া একটি শুকনো থেলো হুঁকা হাতে দিয়া ঘোড়ার গল্প করিত, “দেখ বিলুবাবু, তোমায় ঘোড়ায় বসিয়ে এমন ঘোড়া চালিয়ে দেব যে ঘোড়া ঐ ছাতের ওপর গিয়ে উঠবে, আর ঘোড়া হাওয়া দিয়ে চলে যাবে, আর টগ্‌বগ শব্দ করে

যাবে। আর পক্ষীরাজ ঘোড়া যে আছে, তাতে চড়লে মেঘের ওপর পর্যন্ত যাওয়া যাবে।" সে এইরূপ কোচোয়ানি ভাষায় ঘোড়ার অলৌকিক গল্প বলিত। বালক বিলু সেইসব নিবিষ্টমনে শুনিত আর ভাবিত, "দাঁড়াও, বড় হয়ে একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া কিনতে হবে, আর সেইটা চড়ে খুব উঁচুতে মেঘের উপর দিয়ে বেড়াব।" কোচোয়ানের এই ঘোড়ার গল্পটি স্বামিজী অনেক সময় লোকের কাছে বলিতেন যে, ছেলেবেলায় কোচোয়ান এইসব গল্প বলিত, আর আমার মনে এইসব ভাব হইত।

আর একটি কথা, তখন মাটির একটা ভাঁড়ের মতন করিয়া গোটাকতক তাঁত দিয়া একরকম খেলাঘরের বেহালা হইত। আর ঘোড়ার বালামৃচি দিয়া ধনুকের মত ছড়ি তৈয়ারী হইত। তখন এই খেলাটি এক পয়সা করিয়া বিক্রয় হইত আর খুব চলিত। আস্তাবলের সহিস কোচোয়ানেরা সন্ধ্যার পর ফাঁকা জায়গাটিতে বসিয়া তাহাদের গয়া অঞ্চলের গাঁওয়ালি সুরে বেহালা লইয়া গান করিত। সহিস কোচোয়ানের বেহালা বাজানো ও গাঁওয়ালি সুরে গান বেশ লাগিত। স্বামিজী ছেলেবেলায় এটা খুব দেখেছেন। তাঁহার এতটা ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার একখানি বাংলা বইতে ঐ এক পয়সার বেহালা বাজানোর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বালকই বৃদ্ধ হয়, শুধু একটা পালিশ করা হয় মাত্র। যাহা হউক, তিনি ছেলেবেলার আস্তাবলের নানা প্রকার গল্প অনেক সময় বলিতেন। এই সব ছিল তাঁহার আহ্লাদের প্রিয় গল্প।

ব্যাটবল খেলা

এখন যাহাকে ক্রিকেট খেলা বলা হয়, তখন ব্যাটবল, চলিত কথায় 'ব্যাটম্বল' বলিত। খানকতক ইটের উপর ইট দিয়া একটি উঁচু ঢিপি করা হইত। তার পাশে একজন ব্যাট হাতে করিয়া দাঁড়াইত, তখন দূর থেকে একজন বল দিত। ওদিককার লোক বল লুফিয়া লইবার জন্য দাঁড়াইত। বল যদি ইটে ঠেকিত ত 'আউট' হইত। আবার যে বল দিতেছে তাহার পায়ের কাছে ব্যাটটা ছুঁইয়া আনিতে হইত। ইতিমধ্যে সেও যদি বল ছুঁড়িয়া ইটে মারিত, তাহা হইলে তাহার খেলা শেষ হইত। এই ব্যাটম্বল খেলা বেশ চারিদিকে নজর রাখিয়া সতর্ক হইয়া খেলিতে হইত। ইহাতে হাতের টিপও জোর চাই। কোন্‌দিকে কে বল লুফিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেদিকে নজর রাখা চাই। মোটামুটি বেশ খেলা। বীরেশ্বরের এই খেলাতে বেশ উৎসাহ ছিল। সে বল ঠিক মারিতে পারিত। লাঠিম খেলার মত এটা বোকা খেলা নয়। বীরেশ্বর ব্যাটম্বল বেশ ভাল রকম খেলিতে পারিত। পাড়ার অনেক ছেলে বাহিরের উঠানে জড় হইত এবং বৈকালে ব্যাটম্বল খেলা খুব চলিত। বীরেশ্বর এই খেলার সর্দার বা মোড়ল হইয়া সব হুকুম-হাকাম করিত। বাল্যকালেই বেশ দেখা যাইত যে সর্দারগিরির জন্যই যেন এই বালকটি জন্মিয়াছে। বীরেশ্বর বা বিলে হুকুম করিবে

আর সকল ছেলে শুনিবে। ঝগড়া হইলে বীরেশ্বর মিটাইয়া দিবে, অপর কেহ হইলে ঝগড়া বাড়িয়া যাইত। এইজন্য বীরেশ্বর বা বিলে যতক্ষণ না খেলায় নামিত, খেলাটা বেশ জমিত না।

রাত্রিতে গল্প বলা

রাত্রিতে আমরা বিছানায় শুইতাম। ঘর খুব বড়। দুইখানি তক্তাপোষ জুড়িয়া বড় দুইখানি গদি পাতিয়া তাহাতে ঢালা বিছানা হইত প্রথম বীরেশ্বর শুইত, তাহার পর আমি ও ছোট দুই বোন, তাহার পর দিদিমা বা ঝি-মা, তাহার পর মা। * বীরেশ্বর উল্টাইয়া চোখ দুটি ও মুখটি মাথার বালিশে খানিকক্ষণ চাপিয়া থাকিত। তাহার পর পিঠের উপর শুইত। স্বামিজী মঠে শরৎ মহারাজকে বলিয়া ছিলেন যে, তিনি ছেলেবেলাতেই চোখের সামনে আলোর বিন্দুর মত কতকগুলি দেখিতেন। আলোর বিন্দু কখনও স্থির কখনও বা চঞ্চল থাকিত, সেইজন্য তিনি বালিশে মুখ দিয়া চোখটা চাপিয়া থাকিতেন। যাহা হউক, আমি একটু পরে বলিতাম, "ও দাদা একটা গল্প বল না।" বীরেশ্বর অমনি গল্প বলিতে আরম্ভ করিত,—

"এক বাগ্‌দী বুড়ীর একটা ছাগল ছিল। সকালে ছাগল

* পূজনীয় বিশ্বনাথ দত্ত তখন পশ্চিম গিয়াছিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ তখন জন্মায় নাই। লেখক।

চরতে যায়, বিকেলবেলা সে ছাগলটাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। একদিন একটা দুষ্টু লোক সেই ছাগলটা চুরি করে কেটে খেয়ে ফেলেছে। বাগ্দীবুড়ী বিকেলে ছাগল আনতে গিয়ে ছাগল খুঁজে খুঁজে পায় না। তারপর সেই দুষ্টু লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলে ছাগল কোথায়? সে বাগ্দী-বুড়ীকে বুঝিয়ে দিলে যে ছাগলটা উদ্ধার হয়ে মানুষ হয়েছে এবং অমুক জায়গায় কাজী হয়ে বিচার করছে। বাগ্দীবুড়ী তার দড়ি নিয়ে কাজীর এজলাসের কাছে হাজির। ছাগলটার যেমন একটু দাড়ি ছিল, কাজীরও তেমনি একটু ছোট ছাগল-দাড়ি ছিল। ছাগলের রং কালো, কাজীর রংও কালো। বুড়ীর ঠিক ধারণা হলো যে তার পাঁঠাটা উদ্ধার হয়ে এই কাজী হয়েছে। তাই সে দড়িটায় ফাঁস লাগিয়ে কাজীর দিকে চেয়ে ক্রমাগত বলতে লাগল, 'অর্‌র্‌র্ হিলি আয়।' কাজী ত এজলাস থেকে বুড়ীকে দেখতে লাগল ও তার কথা শুনতে লাগল। তারপর চাপরাসীকে জিজ্ঞেস করলে যে ঐ বুড়ী কেন একশোবার দড়ী দেখাচ্ছে আর বল্‌ছে, 'উর্‌র্‌র্ অর্‌র্‌র্ হিলি আয়।' তখন চাপরাসী গিয়ে বুড়ীকে জিজ্ঞেস করায় বুড়ী বললে, 'কেন, তোমার কাজীর কি সব কথা মনে নেই? আজকেই না হয় কাজী হয়েছে কিন্তু আমি এতদিন তাকে মাঠে চরালুম, ছোলা খাওয়ালুম, গায়ে কত হাত বোলালুম, সব ভুলে গিয়ে এখন চাপরাসীকে জিজ্ঞেস করছে যে ও কি বলে।' এদিকে চাপরাসী কিছু বুঝতে না পেরে

সব কথা কাজীকে গিয়ে বললে। কাজী তারপর এজলাস থেকে নেমে এলো, এসে বুড়ীকে জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি কি চাও, কি বলছ?' বুড়ী অমনি ফাঁসওলা দড়িটা কাজীর গলায় দিয়ে বললে, 'অর্‌র্‌ হিলি আয়; এদের বাড়ী থাকতে হবে না; তুই তোর নিজের বাড়ী আয়।' কাজী ত অবাক; লোকজন হৈচৈ করে উঠল। তখন বুড়ী বললে, 'তুমি ত আমার সেই পাঁঠা অর্‌ হিলি, এখন মানুষ হ'য়ে কাজী হয়েছ, বিচার করছ। আগেকার কথা সব ভুলে গেছ? আমাকে তুমি চিনতে পারছ না?' বুড়ী বলে যেতে লাগল, 'কেন, তুমি ত আমার সেই পাঁঠা। ওমুক লোক বললে যে তুমি উদ্ধার হয়ে মানুষ হয়েছ ও কাজী হয়েছ তাই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। তা বাবু কাজী হয়েছ বেশ হয়েছে, তাতে আমি সুখী হয়েছি, তা বলে আমাকে কি ভুলে যেতে হয়?' তখন কাজী বুঝতে পারলে যে একটা দুষ্টু লোক সেই পাঁঠাটা খেয়ে তাকে এই সব বুঝিয়ে দিয়েছে। তখন কাজী সেই দুষ্টু লোকটাকে ধরিয়ে আনলে এবং সাজা দিলে।" এই 'অর্‌র্‌ হিলি আয়' গল্পটা প্রায়ই হইত। অনেকক্ষণ ধরিয়া এই গল্পটা চলিত এবং নানা রকম স্বর করিয়া এই গল্পটা বলিত। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে স্বামিজী ঘরোয়া বাংলা গল্প অদ্ভুত রকম বলিতে পারিতেন, যাহা শুনিয়া সকলে মোহিত হইয়া যাইতেন। অতি শৈশবেই তাঁহার এই গল্প বলিবার ক্ষমতা হইয়াছিল।

গল্প আবার আরম্ভ হইল—

"এক ছাগল ছিল। সে একটা বাঁশের সাঁকো দিয়ে একটা নদী পার হচ্ছিল। নদীতে খানিকটা গেছে, দেখে না জলে আর একটা ছাগল। ছাগলটা মনে করলে যে একটা ছাগলী জলে রয়েছে। নদীটা যদিও ছোট কিন্তু স্রোত খুব। ছাগলটা সেই ছাওয়াটা দেখে এক লাফ মারলে, মেরে জলে পড়্‌ল, পড়ে মরে গেল।"

তখনই আমরা সব ভাইবোন বলিয়া উঠিলাম, "ও দাদা, তোর গল্প যে বড় ছোট, ফুরিয়ে গেল। তুই আর একটা ভাল গল্প বল।"

অমনি আবার একটা সুরু হইল—

"একবার এক ব্যাঙের বাড়ী খুব যজ্ঞী। তা তাদের পয়সা ফুরিয়ে গেছে। ব্যাঙেদের কর্তা মশাদের বাড়ী গেল, গিয়ে বললে, 'আমাদের বাড়ী যজ্ঞী, অনেক লোক খাবে। তোমাদেরও নেমন্তন্ন; তা তোমরা আমায় কিছু কড়ি ধার দাও। আমি কিছুদিন পরে ফেরৎ দেব।' মশারা ব্যাঙের কর্তাকে কিছু কড়ি ধার দিল। ব্যাঙ তো বাড়ী এসে খুব যজ্ঞী করল। তারপর বর্ষাকাল এল। মশারা দল বেঁধে ব্যাঙের বাড়ীতে এসে, 'কঁড়ি দাঁও ভাই,' 'কঁড়ি দাঁও ভাই', 'কঁড়ি দাঁও ভাই' বলতে লাগল। ব্যাঙেরা তখন খেয়ে দেয়ে খুব মোটা হয়েছে, তারা জলেতে গিয়ে বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে আছে। মশরা তো জলের কাছে যেতে পারে না, তাই ওপর থেকে বলতে

লাগল, 'কঁড়ি দাঁও ভাঁই, কঁড়ি দাঁও ভাঁই, কঁড়ি দাঁও ভাঁই।' ব্যাঙ্ পেটটা ফুলিয়ে ফুলিয়ে বলতে লাগল, 'কে কার কড়ি ধারে, কে কার কড়ি ধারে।' কাজেই মশারা হতভম্ব হয়ে সব ফিরে এল। ফিরে তারা গাছের ওপর বসে রইল। খানিকটা পরে একটা সাপ এল। সাপ এসে ব্যাঙটাকে খানিকটা গিলে ফেললো। আর ব্যাঙটা তখন দম আটকে বল্‌ছে ; 'কড়ি নাও, কড়ি নাও, কড়ি নাও।' মশরা তখন গাছ থেকে বলতে লাগলো, 'কেমন হয়েছে ? এখন সাপের পেটে যাও'।"

এই গল্পটি বীরেশ্বর মশার গুন্‌গুন্ আওয়াজ ও ব্যাঙের গলার আওয়াজের মত করিয়া নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী করিয়া বলিত আর আমরা খুব হাসিতাম ও ঘুমাইয়া পড়িতাম।

ঝিমা-র গল্প

আমাদের ঝিমা অর্থাৎ মাতামহীর মা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি ভাগবতের, পুরাণের ও বৈষ্ণবদিগের নানাপ্রকার কথা ও গল্প জানিতেন। তিনি প্রথম রাত্রে কখনও গল্প বলিতেন এবং শেষ রাত্রি হইলে সকলের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিতেন ও সকলকে কৃষ্ণকথা বলাইতেন। আমাদিগের মাতামহীও ভাগবতের অনেক কথা জানিতেন। তিনিও সব ভাগবতের গল্প বলিতেন। শেষরাত্রে আমাদের ঝিমা সব ভাইবোনকে ঘুম ভাঙ্গাইয়া প্রথম এই স্তবটা বলাইতেন—

"ক বলে কহ কহ কৃষ্ণ কথা কহ।
কি কর্ম করিলে জীব? পেয়ে মানব দেহ॥
খ বলে ক্ষীরোদ সাগরে নারায়ণ।
খণ্ডিবে যতেক পাপ করিলে স্মরণ॥" ইত্যাদি

ধ্রুব ও প্রহ্লাদের গল্প ঝিমা ও দিদিমা অতি সুন্দরভাবে বলিতেন। ধেণুকাসুর, বকাসুর ও পূতনাবধ প্রভৃতি ভাগবতের গল্প আমাদের নিত্য শুনাইতেন ও অভ্যাস করাইতেন। আর বৈষ্ণবদিগের অনেক গান শিখাইতেন, যথা,—

"বারে বারে করি মানা
গোষ্ঠে যেওনা,
ডাকিনীদের পাড়াতে বাস
পথে যাদু যেওনা।"

ঝিমা-র পিতা অর্থাৎ রামদত্তের পিতামহ কুঞ্জবিহারী দত্ত প্রভূত অর্থশালী ছিলেন। নারিকেলডাঙ্গায় বর্তমান যেটি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী, তাঁহার বাড়ী ঐ জমিতেই ছিল। পরে গুরুদাসবাবু জমিটা ক্রয় করিয়া লন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং বৈষ্ণবদিগের গোঁসাই ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার অনেক বৈষ্ণব শিষ্য ছিল। তখনকার দিনে বৈষ্ণব দত্তপরিবার প্রবীণ বা উন্নত ছিল। সেইজন্য কুঞ্জবিহারী বা কুঁচিল দত্তের নাম বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বিশেষ পরিচিত। ঝিমা সেইজন্য বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থাদি ও আচার পদ্ধতি বিশেষভাবে জানিতেন এবং সর্বদাই বৈষ্ণব গ্রন্থের গল্প আমাদের শুনাইতেন। স্বামীজী

আমেরিকা ও ইংলণ্ডে যে সমস্ত বৈষ্ণব গল্প বলিয়াছিলেন, বক্তৃতাকালে অনেক সময় বলিতেন যে তিনি গল্প সমূহের অধিকাংশই ঝিমা ও দিদিমার কাছ হইতে শুনিয়াছিলেন। বালকদের শিক্ষা ঘরেতে হয় এবং মাতা, মাতামহী ও প্রপিতামহীর নিকট হইতে সমস্ত ভাব পায় এবং ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হয়। স্বামীজীর জীবন ইহার একটি বিশেষ উদাহরণস্থল।

ঝিমা এই গল্পটি বড্ড বলিতেন, "এক বিধবা ব্রাহ্মণী একটি গ্রামে বাস করিত। অতি গরীব। তাহার একটি ছোট ছেলে ছিল। ব্রাহ্মণের ছেলে ক্রমশঃ বড় হল, তাকে পাঠশালায় দিতে হবে। তাই বিধবা মা দূরে গ্রামেতে এক গুরুমহাশয়কে অনুরোধ করল যাতে দয়া ক'রে তার ছেলেকে অমনি পড়ায়। গুরু রাজী হলো। কিন্তু পাঠশালায় যেতে হলে একটি জঙ্গল পার হয়ে যেতে হয়। ছেলেটি শিশু, তাই তার মাকে বলত, 'মা সন্ধ্যের সময় যখন জঙ্গল পার হই, তখন বড় ভয় করে, তুমি কাউকে আমাকে দাঁড়াতে বল।' ব্রাহ্মণী গরীব, তার মনে বড় কষ্ট হল, কাঁদতে লাগল। কেইবা তার ছেলেকে দাঁড়াতে যাবে? তাই অনেকক্ষণ কেঁদে, ভেবে চিন্তে, ভগবানকে ডাকতে লাগল। তারপর ছেলেকে বললে, 'আমার এক বড় বেটা, তোর বড় ভাই ঐ জঙ্গলে থাকে। তুই যখন যাবি আর ফিরে আসবি, তখন 'কালচাঁদদাদা' বলে ডাকবি, সে আসবে। সরল শিশু তাই বিশ্বাস করল। সে প্রত্যেকদিন জঙ্গলে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যের সময় বলত, 'কালাচাঁদদাদা! আমি

বাড়ী যাচ্ছি।’ আর জঙ্গল থেকে কে যেন বলত, ‘আচ্ছা ভাই, বাড়ী যাও, কোন ভয় নেই। আমি তোমার পাছে পাছে যাবো, কোন ভয় নেই।’ অকপট বালক বাড়ী এসে সব কথা মাকে বলত। কিছুদিন পরে গুরুমহাশয়ের বাপ মারা গেল। শ্রাদ্ধ হবে। গুরুমহাশয় সব পোড়োকে বললে, ‘তোমরা যে যা পার আনবে, পরশু শ্রাদ্ধ। ছোট ছেলেটা সে কথা তার মাকে বললে, গরীব ব্রাহ্মণী কি বা দেবে, কাঁদতে লাগল। ছেলে কিন্তু বড় আবদার ধরলে। মা বলল, ‘বনে যে তোর কালাচাঁদদাদা আছে, সে কিছু দেবে। তাই তুই গুরুমহাশয়কে দিবি।’ বনে গিয়ে সে কালাচাঁদদাদাকে ডাকল। বন থেকে এক আওয়াজ এলো, ‘শ্রাদ্ধ কবে?’ বালক বললো, ‘পরশু।’ আওয়াজ পুনরায় বলিল, ‘পরশু সকালে আমি জিনিস ঐ গাছের তলায় রা’খব, তুমি গুরু-মহাশয়কে দিও।’ বালক ত খুব আহ্লাদ করতে করতে তার মাকে সমস্ত বলল। নির্ধারিত দিনে ছেলেটি ফর্সা কাপড় পরে সেই বনে গেল, গিয়ে দেখে একটা বড়গাছের তলায় একটি কাল মাটির ভাঁড়ে এক ভাঁড় দই রয়েছে। সেই দই নিয়ে বালক ত আহ্লাদ করে গুরুমহাশয়ের বাড়ী গেল। গুরুমহাশয় এদিকে সেই ছোট ভাঁড়ে দই দেখে একেবারে রেগে গেল। ছেলেটি যত বলে যে................ গুরুমহাশয় ততই রাগে। অবশেষে বলিল, ‘ও আর ভাঁড়ারে কি রাখব, ঐ ব্রাহ্মণের পাতে ঢেলে দে।’ বালক যেই

ব্রাহ্মণের পাতে ঢেলে দিল, অমনি ভাঁড় আবার পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল। তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম—সকলের পাতে ঐ দই ঢেলে দিল, সকলে পরিতোষ হয়ে খেয়ে গেল। সন্ধ্যের সময় গুরুমহাশয় বলিল, হ্যারে, ঐ দই কোথায় পেলি।' বালক বলিল, 'ঐ দই বনে আমার কালাচাঁদদাদা আছেন, তিনি দইটা দিয়াছেন।' তখন গুরুমহাশয়ের চট্‌কা ভাঙ্গল, বললে, 'তোমার কালাচাঁদদাদাকে জিজ্ঞাসা ক'রো, কতদিন পরে আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে।' বালকটি গুরুমহাশয়ের সে কথা জঙ্গলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে, সেই শব্দ বলিল, 'ঐ তেঁতুল গাছে যত পাতা তত জন্ম পরে। আর তোমার এই জন্মেতেই হবে।"

স্বামিজী লণ্ডনে বক্তৃতার সময় এই গল্পটি এমন সুন্দরভাবে বলিয়াছিলেন যে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই শুনিয়া স্তম্ভিত, হর্ষিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই গল্পটি লণ্ডনবক্তৃতায় একটি বিশেষ গল্প বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তিনি ঝিমা-র ও দিদিমার গল্প লণ্ডনে ইংরাজী ভাষায় বলিয়াছিলেন।

বাণযুদ্ধ

আমাদের কাহারও সামান্য একটু সর্দিজ্বর হইলে ঝিমা বাণযুদ্ধ বা উষাহরণের গল্প বলিতেন। এই গল্পটি 'হরিবংশে' আছে। গল্পের শেষে লেখা আছে যে এই গল্প শুনিলে জ্বর ভাল হইয়া যায়। সেইজন্য ঝিমা উষাহরণের গল্পটি

হুবহু সমস্ত বলিতেন। স্বামিজী আমেরিকাতে বক্তৃতাকালে এই গল্পটি বলিয়াছিলেন কিনা জানি না। এইজন্য বিশদভাবে গল্পটি এখানে দেওয়া হইল না। আমেরিকা হইতে সারা ফক্স ও রেবেকা ফক্স নামে দুই ভগিনী এখানে আসিয়াছিলেন। ছোট ভগিনীটি হরিদ্বারে আমাকে কয়েকবার বলিয়াছিলেন যে স্বামিজী বক্তৃতাস্থলে পুরাণের গল্প বলিতে বড় ভালবাসিতেন এবং অনেকস্থলে বলিতেন যে এই গল্পটি তিনি তাঁহার মাতামহীর কাছে শিখিয়াছিলেন। মোটকথা পুরাণের অধিকাংশ গল্পই ছেলেবেলায় আমরা বিছানায় শুইয়া শুনিয়াছিলাম।

ঝিমা বাণযুদ্ধ বা ঊষাহরণের গল্প শুনাইয়া আর একটি ছড়া বলিতেন—

"স্বর্গ থেকে এলো বুড়ী, হাতে কোরে নড়ি,
রস খায় রস খায় রসে করে ভর,
খোকাবাবুর বল্‌সা নিয়ে পাশতলা দিয়ে সর।" ইত্যাদি

আর একটি ছড়া ছিল—

"হাড়ীর মা-র চণ্ডীর দোহাই,
নৃসিংহদেবের দোহাই,
আত্মারাম সরকারের ভাদর বউএর দোহাই,
যা জ্বর ছেড়ে যা।" ইত্যাদি

এই বলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনবার ফুঁ দিতেন আর বলিতেন, "ভাল হয়ে গেছে।" আমরা বলিতাম, "ভাল হ'য়ে গেছে।" সত্যি জ্বর সেরে যেত। আর আমরা

উঠিয়া খানিকক্ষণ ধেই ধেই করিয়া নাচিতাম আর একটা পয়সা পাইতাম। তখনকার দিনে ছোট ছেলের জ্বর সারাবার এই সব মন্ত্র ছিল। তাই এস্থলে প্রদত্ত হইল।

ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্প।

স্বামিজী লণ্ডনে বক্তৃতাকালে এই বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী বা ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্পটি অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছিলেন। এটি আমরা ঝিমা-র কাছে শুনিয়াছিলাম, তাই এস্থলে প্রদত্ত হইল। "এক বনে এক গাছের ওপর এক ব্যাঙ্গমা ও ব্যাঙ্গমী বাস করত। তাদের গুটীকতক ছানা হল। একদিন রাত্রে বড় শীত ও ঝড়বৃষ্টি। একটী সাধু এসে সেই গাছের তলায় বসল। সাধুটি শীতে কাঁপতে লাগল। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। সে মুড়ি দিয়ে গাছের তলায় বসে রইল। ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীকে বললে, 'দেখ আমরা গৃহস্থ, আমাদের আশ্রমে একটি সাধু এসেছে। সে উপবাসী, আমাদের ধর্ম হচ্ছে সাধুকে কিছু খাওয়ান। তা কি করি। এখন দেখছি সাধুটির বড় শীত। আমরা পাখী, গায়ে পালক আছে, তাই শীত নেই, ও মানুষ তাই ওর বড় শীত।' এই বলে মদ্দা পাখী একখানা গাছের সরু ডাল মুখে করে উড়ে গিয়ে কামারশালে ফেলে দিলে। রাত্রিতে কামার ঘুমচ্ছিল কিন্তু তার সেখানে আগুন ছিল। গাছের ডালটা যখন একদিকে ধরে উঠল, মদ্দা পাখী সেই আগুন নিয়ে উড়ে এল। এদিকে মাদী পাখী শুকনো গাছের ডাল এনে এনে ফেলতে লাগল

আর মদ্দা পাখী সেই আগুনটুকু ফেলে দিলে। সাধুটি কাঠেতে সেই আগুনটুকু দিয়ে বেশ ধুনী জ্বালিয়ে আগুন সেঁকতে লাগল ও তখন একটু গরম হল। তখন ওপর দিকে চেয়ে দেখলে যে দুটী পাখীতে এই কাজ করছে। সে তখন বিস্মিত হল। তারপর পাখী দুটো পরস্পর বলতে লাগল, 'আমরা গৃহী, আমাদের বাড়ীতে অতিথি এসেছে, তা কি খেতে দি। আমাদের ঘরে কিছুই নেই। আমরা নিত্য আনি, নিত্য খাই। কোন জিনিস সঞ্চয় করি না। সাধুও নিত্য আনে, নিত্য খায়। সেও কিছু সঞ্চয় করে না। ও মানুষ হলেও আমাদের ধরণের জীব।' মাদী পাখীটা বললে, 'আমি আগুনে পড়ে মরে যাই, তাহলে সেই পোড়া মাংস খেয়ে ক্ষিদে মিটবে।' মদ্দা পাখী বললে, 'তুমি গেলে ছেলেপুলে কে দেখবে। আমি বরঞ্চ যাই তাহ'লে ছেলেপুলের কোন ক্ষতি হবে না।' এই কথা শুনে বাচ্ছাগুলি বললে, 'দেখুন, আপনারা পিতামাতা, আপনারা থাকুন, আমরা পুড়ি। কারণ আপনারা দু'জন থাকিলে আবার সন্তান হইবে। আর বিশেষতঃ আমাদের এখনো পালক উঠেনি, খুঁটে খেতে পারি না। আপনারা গেলে আমাদের দেখবে কে?' এই বলে বাচ্ছারা ঝাঁপিয়ে আগুনে পড়ল, সাধুটি পোড়া মাংস খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হল। তারপর মাদীটা পুড়ল, তারপর মদ্দাটাও পুড়ে গেল। তাহাদের পক্ষীদেহ নাশ হলে তাহারা দেবদেহ প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে চলে গেল।" সাধুটি অবাক হয়ে পাখীদের এই সমস্ত কাজ দেখতে লাগল। এই গল্পটী

স্বামিজী লণ্ডনে অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছিলেন, সেইজন্য এস্থলে বলা হইল।*

কাগিবগির গল্প

মহাভারতে যাহা ধর্মব্যাধের উপাখ্যান বলিয়া অভিহিত হয়, বাঙ্গলা দেশে সেইটি চলিত ভাষায় কাগিবগির গল্প বলে। আমরা ঝিমা ও দিদিমার কাছে এই গল্পটি শুনিতাম। "এক বনে এক ঋষি তপস্যা করত। অনেকদিন ধরে তপস্যা করে আর একটা গাছের তলায় বসে থাকে। একদিন এক বক সেই গাছের ওপর বসে সাধুটির গায়ে মলত্যাগ করল। এইতো সাধু ক্রুদ্ধ হয়ে সেই বকটার দিকে চাহিল আর বকটা ভস্ম হয়ে মরে গেল। তখন সাধুর মনে বড় অহঙ্কার হল। এই তো সিদ্ধি হয়েছে, এই বলে সে পৃথিবীতে শাসন করতে বেরুল। গিয়ে গিয়ে এক গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত। গৃহিণী তখন রুগ্ন স্বামীকে সেবা করছিল। সাধুটী দরজায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করল, 'ভিক্ষা দাও।' গৃহিণী ভেতর থেকে বলল, 'আপনি অপেক্ষা করুন। আমার এখন হাত জোড়া।' এই তো সাধু মহাক্ষ্যাপ্পা হয়ে বলে উঠল, 'তুমি জানো, আমি

---

* এই সকল গল্প বৌদ্ধদিগের জাতকের গল্পের ন্যায়। সম্ভবতঃ যখন বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধমত প্রবল ছিল তখন জাতক অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা দেশে এইরূপ অনেক গল্প তৈয়ারী হইয়াছে। যদিও এ সব প্রাদেশিক গল্প তবুও বৌদ্ধদিগের জাতকে লিখিত গল্পের অনুরূপ।

তোমায় এক্ষুনি ভস্ম করতে পারি।' এই বলে সাধু ভয় দেখাতে লাগল। ভেতর থেকে গৃহিণী বলে উঠলো, 'ঠাকুর, এ তো বনে কাগিবগি ভস্ম করা নয়। অত চোখ রাঙিয়ে ডবডবানি দেখিয়ো না, চুপ করে বসে থাক। আমার স্বামীর সেবা হলে তবে তোমাকে ভিক্ষে দেবো। সাধু বিস্মিত হল যে কি করে সে এই বক-ভস্ম কথা জানলে। তখন বিনীত-ভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি করে এই সমস্ত কথা জানলেন?' স্ত্রীলোকটি বললে, 'আমার স্বামী রুগ্ন। আমি সর্বদাই তাঁহার সেবা করিয়া থাকি। তাঁহার সেবার পর একটু সময় পাইলে স্নানাহার করি; আমার জপধ্যান তীর্থ ইত্যাদি যাহা কিছু আমার স্বামীর সেবা। আমি এই পুণ্যে পৃথিবীর সকল জিনিস দেখিতে পাই ও বুঝিতে পারি।' সাধুটি বলিল, 'আচ্ছা, এরকম আর কোন লোক আছে?' স্ত্রী-লোকটি খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'অমুক নগরে এক ব্যাধ আছে। সে মাংস বিক্রয় করে। সে তোমাকে ধর্মোপদেশ দিবে। তুমি তার কাছে যাও।' সাধু আদেশ শিরোধার্য করে চলতে চলতে সেই ব্যাধের কাছে পৌঁছিল। ব্যাধ তখন হাটে মাংস বিক্রয় করছিল। সে সাধুটিকে বললে, 'তুমি অপেক্ষা কর, আমার কাজকর্ম শেষ হলে তোমার সহিত কথাবার্তা কইব।' তারপর ব্যাধ হাট হতে বাড়ী আসিয়া বৃদ্ধ পিতামাতাকে স্নানাহার করাইয়া বাড়ীর সমস্ত ছেলেদের আহার করাইয়া সাধুটিকে আহার করাইল ও নিজে আহার করিল,

তখন অনেক জ্ঞানের কথা হইল। সাধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি এ সব কথা কি করে জানলেন, আপনি ত মাংস বিক্রেতা।' ব্যাধ বলল, 'আমি পিতামাতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করি এবং স্ত্রী পুত্র ও পোষ্যদিগকে যথাসম্ভব স্নেহ ও আহার দিয়া থাকি। সেই পুণ্যে আমি এই সব জানিতে পারি।' সাধুটি ব্যাধের কাছে জ্ঞানলাভ করিয়া আবার তপস্যা করিতে চলিয়া গেল।"

স্বামিজী লণ্ডনে এই গল্পটি সুন্দরভাবে বলিয়াছিলেন, তাই এস্থলে প্রদত্ত হইল।

নিবেদিতার শিশু উপাখ্যান (Cradle Tales)

নিবেদিতা যে 'Cradle Tales' বইখানি লিখিয়াছেন, সেটি ছাপা হইবার পূর্বে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি এ সকল গল্প স্বামিজীর কাছে শুনিয়াছেন। তবে ইংরাজের রুচি অনুযায়ী সামান্যভাবে পরিবর্তিত করিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে স্বামিজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি (স্বামিজী) তাঁহার মাতা, মাতামহী ও প্রমাতামহীর কাছে বিছানায় শুইয়া এই গল্পগুলি শুনিয়াছিলেন, আর এই গল্পগুলি এত বদ্ধমূল হইয়াছে যে চিরকাল একটা ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। প্রকৃত আমরাও ঝিমা-র কাছে পুরাণের অধিকাংশ গল্পই শুনিয়াছিলাম। এমন কি খুল্লনার গল্প, চাঁদ সদাগরের গল্প, বেহুলার গল্প, কালকেতুর গল্প ও শ্রীমন্ত

সদাগরের গল্প—যে সকল কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে—সমস্তই শুনিতাম।

শ্রদ্ধেয় গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় একবার বলিয়াছিলেন যে তিনি বাল্যকালে বৃদ্ধাদের নিকট হইতে পুরাণের অনেক গল্প শিখিয়াছিলেন। তিনি বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন যে আমার পুরাণ পড়ার বিদ্যা ঐ পর্যন্ত। ঐগুলিকেই তিনি নানা ভাবে নাটক করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার নিজের কৃতিত্ব বহু কিন্তু মূলতঃ বৃদ্ধাদের কাছ হইতে শিখিয়াছিলেন।

পুরাণের আরও অনেক গল্প শুনিতাম কিন্তু স্বামিজী বক্তৃতা-কালে সেগুলি বলেন নাই বলিয়া এখানে প্রদত্ত হইল না।

বিশ্বনাথ দত্তের পশ্চিম গমন

বিশ্বনাথ দত্ত কলিকাতার হাইকোর্টের এটর্নি ছিলেন কিন্তু ইংরাজী ১৮৭১ সালে কার্যগতিকে তাঁহাকে পশ্চিমে যাইতে হইল। বিশ্বনাথ দত্ত যেমন প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেন তেমনি বড় চালে থাকিতেন। অনেক চাকর তিনি রাখিতেন ও তাঁহার খাওয়া-দাওয়া বিশেষ পারিপাট্য ছিল। তাঁহার কথাই ছিল, "ছোট ছেলেকে ভাল করে খাওয়াতে হয়। তাহলে তার মাথায় বুদ্ধি হয়। কিন্তু ছেলেবেলায় তেজস্কর জিনিস না খাওয়ালে ছেলের মাথা ভাল হয় না। ছেলেদের জন্য কিছু রেখে যাওয়ার দরকার নেই। ভাল খাওয়াও আর লেখাপড়া শেখাও তাহলে ছেলেরা করে নেবে। আর টাকা রেখে গেলে ছেলেরা

মুখ্যু হয়ে উড়িয়ে দেবে।” আর একটা কথা বলতেন, “ছেলেকে নীচ সঙ্গে বেড়াতে দেবে না। বাড়ীতে যা দুষ্টামি করে করুক, কিন্তু রাস্তায় না যায় আর নীচ সঙ্গে না মেশে এই দুটো জিনিস লক্ষ্য রাখতে হয়।” তিনি নানাবিধ জিনিস খাইতেন ও উপস্থিত সকলকে খাওয়াইতেন এবং নিজে নানা প্রকার রন্ধন করিতে পারিতেন।

বিশ্বনাথ দত্ত কলিকাতা হইতে মোগলসরাই পর্যন্ত ট্রেনে গমন করেন। তখন ঐ পর্যন্ত ট্রেণ হইয়াছিল। তাহার পর টঙ্গা ও অন্যান্য যানাদি করিয়া লক্ষ্মৌ, দিল্লী প্রভৃতি অনেক স্থলে যান ও ওকালতি করেন। তখন মিউটিনির পর, পশ্চিমে ইংরেজী জানা লোকসংখ্যা খুব কম ছিল। তখনকার দিনে দিল্লী ও পাঞ্জাব আদালতে উর্দ্দু ভাষা প্রচলিত ছিল। বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় উর্দ্দু, ফার্সি ও আরবি ভাষা ভাল রকম জানিতেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি হওয়ায় তাঁহার পসার শীঘ্রই জমিয়া গিয়াছিল। তিনি যেমনি রোজগার করিতেন তেমনি বড় চালে থাকিতেন। তিনি চাল কখনও কমাতে পারেন নাই। দুঃখ্ চেটেগিরি একেবারে করিতে বা সহ্য করিতে পারিতেন না। দিল্লী হইতে টঙ্গা করিয়া লাহোরে যান এবং সেখানে গিয়াও ওকালতি করেন। এখন দু’পয়সা বা চার পয়সার টিকিট দিলে চিঠি ভারতবর্ষের সব জায়গায় যায়, তখন এরূপ ছিল না। তখন মাইল হিসাবে পয়সা দিতে হইত। আমরা যখন দিল্লী বা লক্ষ্মৌএ চিঠি পাঠাইতাম

তখন ॥০ বা ॥৵০ টিকিট দিতে হইতে। তখন সবে মণি অর্ডারের প্রথা প্রচলন হইয়াছে। মণি অর্ডারের টাকা পয়সা অফিসে পাওয়া যাইত না, নোটের মত কারেন্সি হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিতে হইত। সে বড় ঝঞ্ঝাট ছিল। বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় প্রথম যে দশজন এ্যাডভোকেট হন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। কোর্টের ভাষা উর্দ্দু ছিল। তখন অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারির লোকেরা জজ হইত। সিভিলিয়ান জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট তত হইত না। সেইজন্য উকিলের এত আবশ্যক ছিল। বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় বলিতেন, "পাঞ্জাবে তখন উকিলের কদর খুব ; জজ একটা আরদালী পাবে তো এ্যাডভোকেটও একটা আরদালী পাবে। শীতকালে জজ ঘর গরম করার জন্য আধ মণ কাঠ পাবে। এ্যাডভোকেট পনের সের পাবে আর গরমকালে রাত্রে পাখা টানার জন্য একটা মজুর পাবে।" বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় পাঞ্জাবের অনেক জায়গায় ওকালতি করিয়া অবশেষে লাহোর আসিয়া ওকালতি করিতে লাগিলেন ও তাঁহার খুব পসার হইল। ১৮৭৬ সালে তিনি লাহোরে দুর্গা পূজা করেন, অবশ্য ঘটেপটে হইয়াছিল ও অনেক লোক খাওয়াইয়াছিলেন। আমি (লেখক) যখন মার্শাল ল'র বছরে লাহোরে ছিলাম তখন একটি বৃদ্ধ মাঝে মাঝে আসিতেন এবং বলিতেন যে ছেলেবেলায় তিনি বিশুবাবুর মুহুরী ছিলেন এবং তাঁহার অর্থোপার্জন ও খরচ-পত্রের অনেক কথা বলিতেন। কিন্তু সেই বৎসর লাহোরে বিশেষ বরফ পড়ায় বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয়ের কান কালা হইয়া

যায়। সেইজন্য তিনি সমস্ত পসার ছাড়িয়া লাহোর ত্যাগ করিয়া রাজপুতনায় চলিয়া যান। তখন উর্দ্দু ও ইংরাজী জানা উকীলের সর্বত্র সমান সমাদর ছিল। রাজপুতনায় তিনি অল্পদিন থাকিয়া ইন্দোরে চলিয়া যান এবং ইন্দোর হইতে ইংরাজী ১৮৭৮ সালে সেণ্ট্রাল প্রভিন্সের (মধ্য প্রদেশ) বিলাসপুরে চলিয়া যান এবং তথা হইতে রায়পুরে ফিরিয়া আসিয়া কিছুদিন প্র্যাক্‌টিস্ (আইন ব্যবসা) করেন। তিনি আইনজ্ঞ, মিষ্টভাষী ও ধীর স্বভাবের লোক ছিলেন, সেইজন্য জজেরা তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। তখনকার দিনে আদালতে একটি বা দুটি উকিল ছিল। আইনটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ায় মিলিটারী জজেদের বড় সুবিধা হইত। এইজন্য তাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ খাতির করিতেন। এইজন্য তিনি যখন যেস্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, জজেরা ভাল প্রসংশাপত্র (টেষ্টিমোনিয়্যালস বা সার্টিফিকেট) দিয়াছেন। তিনি এখনকার দিনের মত নকড়া-ছকড়া উকীল ছিলেন না। তখন উকীলের সম্মান ইজ্জত খুব ছিল।

এস্থলে একথা বলা অত্যুক্তি হইবে না যে দুর্গাপ্রসাদ দত্ত সন্ন্যাসীবেশে ভারতবর্ষে অনেক ঘুরিয়াছিলেন, আর তাঁহার পুত্র উকীল হইয়া সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ ঘুরিয়াছিলেন এবং বিশ্বনাথ দত্তের তিন পুত্র নানাভাবে অনেক দেশ ঘুরিয়াছেন। এই ঘোরা ব্যামোটা যেন তাঁহাদের বংশের একটা ধারা।

বিশ্বনাথ দত্তের লেখাপড়া ও মেধা

পূজনীয় বিশ্বনাথ দত্তের বিদ্যাচর্চার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি ইংরাজী, উর্দু, আরবি, ফার্সি চারিপ্রকার ভাষা বিশেষরূপে জানিতেন এবং উর্দু, ফার্সির পক্ষপাতী ছিলেন। ইতিহাস বিষয়ে তাঁহার অনেক পড়া ছিল এবং শেষ সময় পর্যন্ত অনর্গল ইতিহাস মুখস্থ বলিয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন, "তোদের তো ফক্কেকারী পড়া, আমাদের সেকালে হাড়ভাঙ্গা পড়া ছিল।" ইতিহাস তাঁহার বিশেষ প্রিয় পাঠ্য ছিল। এইজন্য তাঁহার তিন সন্তানের ভিতর ইতিহাস পড়ার ইচ্ছাটা অতি প্রবল হইয়াছে।

ধর্ম বিষয়ে তাঁহার ভাব অতি উদার ছিল। কোন বিষয়ে সঙ্কীর্ণতা বা গোঁড়ামি ছিল না। বাইবেল, কোরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত তিনখানি গ্রন্থই তিনি বিশেষ করিয়া পাঠ করিতেন এবং উঃ চঃ মিত্র (উপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র) নামক জনৈক ব্যক্তি যখন শ্রীমদ্ভাগবত ছাপাইতে লাগিলেন, পূজনীয় বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় সেই ভাগবতের গ্রাহক হইয়া বেশ নিবিষ্টমনে পড়িতেন। বাড়ীতে অনেক পুস্তক ছিল, তাহার মধ্যে একখানি চামড়া দিয়া বাঁধান বাইবেল* পাওয়া গিয়াছিল। বহুকাল পূর্বে একখানি বাইবেল ছাপা হয়—গ্রীক, মুর ও ল্যাটিন অনুবাদ। সেই বইখানি আমি হেদোর স্কুলের এক পাদ্রীকে দিয়াছিলাম।

*Cassel's "Illustrated Bible."

বাড়ীতে অনেক প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ছিল কিন্তু পরে সে সব নষ্ট হইয়া যায়। বিশ্বনাথ দত্তের ধর্মবিষয়ে উদার ভাব থাকায় স্বামিজীর ও অপর দুই ভায়ের এইরূপ উদার ভাব হইয়াছে। বংশের ভাব ও ধারা না জানিলে বংশের এক ব্যক্তি হঠাৎ কি করিয়া নানাপ্রকার ভাব ও ধারা প্রকাশ করিয়া থাকে ইহা বুঝা যায় না। এইজন্য বংশের ভাব ও ধারা কিছু কিছু বলা আবশ্যক। শ্রীতারকনাথ দত্ত—যাঁহাকে ছোটকাকা বলিতাম, তিনি হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। গণিত বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন—প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন, বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয়বারের ছাত্র। তিনি পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিতেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বসিত। মিষ্টার সর্ট তাঁহার ছাত্র তারকনাথ দত্তকে ঐ কলেজের গণিতের অধ্যাপক করিয়া দেন। কিন্তু আইন পরীক্ষায় সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া তিনি ওকালতি করিতে যান এবং অধ্যাপনা কার্য পরিত্যাগ করেন। তাঁহার বৈঠকখানার আলমারীতে সেল্‌ফভরা অনেক গ্রন্থ ছিল। কিন্তু পরে সে সব নষ্ট হইয়া যায়।

বিশ্বনাথ দত্তের দান

পূজনীয় বিশ্বনাথ দত্ত অতিশয় দাতা লোক ছিলেন। কাহারও কষ্ট দেখিলে তিনি বড় ব্যথিত হইতেন। দূর সম্পর্কের অনেক ছাত্রকে বাড়ীতে রাখিয়া তিনি তাহাদের

বিদ্যাশিক্ষা করাইতেন এবং পরে তাহারা সকলেই কৃতবিদ্য হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পাড়ার কোন ব্যক্তি কষ্টে পড়িলেই সে বিশ্বনাথ দত্তকে জানাইত এবং কিছু না কিছু সাহায্য পাইত। এইজন্য তাঁহাকে পাড়ায় দাতা বিশ্বনাথ দত্ত বলিয়া ডাকিত। গরীব দুঃখীকে দান করা তাঁহার যেন একটা ব্যামোর মত ছিল। তিনি বলিতেন, "আমার ছেলেদের জন্য ভাবতে হবে না, তারা নিজেরা করে নেবে। কিন্তু এদের সেরূপ শক্তি নেই এইজন্য এই গরীব লোকদের দেওয়া আবশ্যক।" স্বামিজীর এই দানের ভাবটা পিতা-পিতামহের নিকট হইতে আসিয়াছিল। এইজন্য তিনি নিজের জন্য কখনও কিছু রাখিতে পারিতেন না।

বিশ্বনাথ দত্তের লোকজনকে খাওয়ান

পূজনীয় বিশ্বনাথ দত্ত আহারবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। নিজে যেমন নানাপ্রকার বস্তু রাঁধিতে পারিতেন তেমনি লোক খাওয়াইতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। পোলাও ও মাংস তিনি অতি উৎকৃষ্ট রাঁধিতে পারিতেন। একজন পাচক উনানের কাছে বসিত এবং তিনি দূর হইতে সমস্ত বলিয়া দিতেন এবং হাঁড়ি থেকে হাতা করিয়া রান্নার জিনিস সম্মুখে আনিলে সব স্থির করিয়া বলিয়া দিতেন। তাঁহার হাতের রান্না অনেকবার খাইয়াছি। এখনও তাহা ভালরকম মনে আছে।

পূজনীয় বিশ্বনাথ দত্ত নিজের তত্বাবধানে সেইসকল রন্ধন করাইয়া সকলকে খাওয়াইতেন। নানাবিধ উপাদেয় জিনিস বাড়ীতে সর্বদাই প্রস্তুত হইত এবং অনেক লোককে তিনি ডাকাইয়া খাওয়াইতেন। স্বামিজী ছেলেবেলায় বাড়ীতে সর্বদাই এই সকল দেখিতেন বলিয়া তাঁহার এই রন্ধনবিষয়ে প্রবৃত্তি ও নিপুণতা লাভ হইয়াছিল এবং এইজন্যই এই ভাবটি তাঁহার ভিতর বেশ ছিল। খাওয়াদাওয়া বিষয়ে পূজনীয় বিশ্বনাথ দত্ত খুব উঁচু চালে থাকিতেন। কোন রকমের দুঃখ্ চেটেমি তিনি পছন্দ করিতেন না।

সঙ্গীত চর্চা

পূজনীয় বিশ্বনাথ দত্ত জীবনের এক সময়ে ওস্তাদ রাখিয়া কিছু সঙ্গীতও অভ্যাস করিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে অবস্থানকালে তিনি আপনার মনে মাঝে মাঝে বেশ সুস্বরে গাহিতেন। পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ দত্তের কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল এবং বেশ গাহিতে পারিতেন এবং মাতা শ্রদ্ধেয়া ভুবনেশ্বরীর কণ্ঠস্বরও খুব মিষ্ট ছিল। কৃষ্ণযাত্রার গান তিনি আপন মনে বেশ গাহিতেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি। এইরূপ নানাদিক হইতে শক্তি আসায় স্বামিজীর সঙ্গীতের ইচ্ছা খুব প্রবল হইয়াছিল এবং তিনি কলিকাতায় ধ্রুপদ গায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আমরা না জানার দরুন বলি যে, হঠাৎ বংশ হইতে এক প্রসিদ্ধ লোক উদ্ভূত হইল। কিন্তু বংশের অন্তঃ-

সলিলা স্রোত অনবরত চলিয়া থাকে, সেই শক্তি নানা কারণে পরিবর্ধিত হইয়া একটা বিরাট রূপ ধারণ করে। হঠাৎ কোন জিনিস প্রায় হয় না। বংশের মনস্তত্বটা বিশেষ করিয়া জানা উচিত তাহা না হইলে একটা বিশেষ লোকের মনস্তত্ব ভাল করিয়া বুঝা যায় না। এইজন্য এস্থলে এসকল কথা বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে।

অর্শ ভাল হওয়া

যৌবনকালে পূজনীয় বিশ্বনাথ দত্তের ভগন্দর ব্যায়রাম হইয়াছিল। তখনকার দিনে কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসা সমানভাবে চলিত। বাড়ীতে একজন হাকিম নিত্য দেখিয়া যাইতেন। এই হাকিমসাহেব বেশ বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি বিশ্বনাথ দত্তের ভগন্দরের কথা শুনিয়া ঔষধ দিলেন এবং সর্বদা ওল খাইতে বলিলেন। এই ত গেল ঔষধ ও আহারের ব্যবস্থা। কিন্তু হাকিমী চিকিৎসার একটা বিশেষত্ব এখানে বলা আবশ্যক। হাকিম বলিলেন, "মলত্যাগের পর বাড়ীর কানাচে অনেক ঝোপ-জঙ্গল আছে, সেই জঙ্গল হইতে দুই হাতে তিনবার মুঠা করিয়া পাতা তুলিয়া লইবেন অর্থাৎ ছয় মুঠা পাতা, যে কোন পাতাই হউক, তাই দিয়া মলদ্বার পরিষ্কার করিবেন, তাহার পর জলশৌচ করিবেন।" মাস তিনেক এই পাতা ব্যবহার করাতে ভগন্দর একেবারে আরোগ্য হইয়া গেল। হয়ত কোন বিশেষ পাতার বা ৫।৬ পাতার রস

মিশিয়া এক কোন বিশেষ ঔষধ হইল যাহাতে ক্ষতস্থান আরোগ্য হইল। তখন হাকিমী ব্যবস্থা এইরূপ ছিল। স্বামিজী এই গল্পটি বেলুড়মঠে কয়েকবার বলিয়াছিলেন।

হাকিমের আর একটি উপাখ্যান এস্থলে প্রদত্ত হইল। হাকিমী চিকিৎসায় প্রস্রাব দেখিয়া রোগ নির্ণয় করা এক পদ্ধতি ছিল। তবে সর্বত্রই ঐ প্রথা ছিল কিনা বলিতে পারি না কিন্তু আমাদের বাড়ীর হাকিমের ঐ প্রথাটা ছিল। রামচন্দ্র দত্ত তখন বালক। সে আর দু'একটি কমবয়স্ক বালক মিলিয়া একটা ফুকো শিশি করিয়া আস্তাবল হইতে ঘোড়ার প্রস্রাব আনিয়া বুড়ো হাকিমসাহেব সকালবেলা বৈঠক-খানায় বসিলে তাঁহাকে তাহারা পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিল "ও হাকিমসাহেব, এই লোকটির কি ব্যামো হয়েছে বলে দিন না।" এইরূপ বলিবার কারণ, হাকিমসাহেব প্রস্রাব দেখিয়া রোগ নির্ণয় করিতেন। বৃদ্ধ হাকিম এইরূপ বিদ্রূপে প্রথমে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন কিন্তু প্রবীণ লোক বালকের সহিত বাগবিতণ্ডা বৃথা ভাবিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। কিন্তু পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করায় হাকিম বলিলেন, "ইস্কো যাস্তি কর্‌কে দানা পিলাও।" অর্থাৎ এটি ঘোড়ার প্রস্রাব, মানুষের নয়। আশ্চর্যের বিষয় এই রামচন্দ্র দত্ত ভবিষ্যতে মেডিক্যাল কলেজের কেমিষ্ট্রীর এ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসর ছিলেন এবং প্রস্রাব পরীক্ষা করা তাঁহার বিশেষ কাজ ছিল এবং ইহাতে তিনি বিশেষ অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ হাকিমকে ঠাট্টা

করায় কিন্তু তাঁহাকে নিজে শেষে সেই কাজ করিতে হইয়াছিল।

মাতা ভুবনেশ্বরীর কথা

পূজনীয়া মাতা ভুবনেশ্বরীর পড়াশুনার একটা বিশেষ অভ্যাস ছিল। দুপুরে কয়েক ঘণ্টা এবং রাত্রে কয়েক ঘণ্টা তিনি নিত্য পাঠ করিতেন। তাহা না হইলে তাঁহার অতি কষ্ট হইত। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি বিখ্যাত ছিল। গান বা কবিতা একবার মনোযোগ দিয়া শুনিলেই তাঁহার বেশ স্মরণ থাকিত। স্বামিজী বা আমি যে সকল চলিত কবিতা বলিয়া থাকি, সে সকলের অধিকাংশ পূজনীয়া মাতার নিকট হইতে শুনিয়াছি এবং তাহাই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। স্বামিজী ত প্রায়ই মায়ের কাছে শেখা ছড়া বা কবিতা আওড়াইতেন। পিতা ও মাতার বিদ্যাচর্চার বিশেষ অনুরাগ থাকায় সন্তানদের ভিতর বিদ্যাচর্চার প্রবৃত্তি প্রবল হইয়াছে। স্মরণশক্তি বিষয় পিতার বা মাতার কাহার প্রাধান্য ছিল একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না কারণ উভয়ের স্মরণশক্তি প্রখর ছিল। এই জন্য সন্তানদের এই ক্ষমতা স্বাভাবিক হইয়াছে। অপর সাধারণ হইতে ভ্রাতৃত্রয়ের যে বিদ্যানুশীলনের তীব্র চেষ্টা, তাহা পিতামাতা হইতে আসিয়াছে। একদিনে বিবেকানন্দ হয় না, বংশের পরিণতিতে বিবেকানন্দ হয়।

মা-র কাছে প্রথম ইংরাজী শিক্ষা

বীরেশ্বরের খুব শৈশবে খেয়াল ছিল যে সে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত

পড়িবে। ইংরাজী বিদেশী ভাষা ও ম্লেচ্ছ ভাষা, ওটা পড়িতে নাই। তাহার বিদেশী ও ম্লেচ্ছ ভাষার উপর বিশেষ ঘৃণা ছিল, একেবারেই পড়িতে চাহিত না। মা বাঙ্গলা লেখাপড়া বেশ ভাল রকম জানিতেন এবং তখনকার দিনে পাদরী মেম মাষ্টারণী রাখিয়া ইংরাজী শিখিয়াছিলেন ও সেলাই বুনন শিখিয়াছিলেন। মোট কথা First Book-এর কতকটা পড়াইবার মত শিখিয়াছিলেন। বীরেশ্বর যখন কিছুতেই ইংরাজী পড়িবে না ও বড় দুরন্তপনা আরম্ভ করিত, মা তখন তাহাকে নিজে পড়াইতে আরম্ভ করিতেন। তিনি বাঙ্গলা পড়াইতেন, পরে ইংরাজীও সুরু করিলেন। এইজন্য পড়াশুনা শীঘ্র শীঘ্র আগাইয়া যাইত। আমিও মায়ের কাছে প্রথম বাঙ্গলা পড়াশুনা শিখি এবং চার পাঁচখানা বাঙ্গলা বই তাঁহার কাছে পড়িয়াছিলাম। লেখাপড়া জানা মায়ের কাছে ছেলেরা পড়াশুনা করিলে তাহারা সহজে শিখিতে পারে, এটী তাহার একটি বিশেষ উদাহরণ। মা বৃদ্ধ-বয়সে মৃত্যুর দিনকতক আগে পর্যন্ত দুপুরবেলা ও রাত্রে নিয়মমত বই পড়িতেন।

লালাবাগান

লালাবাগান ও কারবালার পুকুর এক মুসলমানের সম্পত্তি ছিল। তাহাদের কি এক মকর্দমা হয়। বিশ্বনাথ দত্ত এটর্ণী, এক তরফের উকীল হন। সম্ভবতঃ উকীলের খরচ দিতে না পারায় বা অন্য কোন কারণে ঐ দুটো জমি তাহারা লিখিয়া

দেয়। তদবধি ঐ দুটো জমি বিশ্বনাথ দত্তের হইল। কিন্তু তিনি ভুবনেশ্বরীর নামে ঐ সম্পত্তি করিয়া রাখিলেন। রামচন্দ্র দত্তের পিতা নৃসিংহ দত্ত ঐ বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করিতেন ও খাজনা আদায় করিতেন। ঐ দুটো জমি হইতে বিস্তর আয় হইত। ভাল বন্দোবস্ত করায় খাজনা খুব উঠিতে লাগিল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কেনার মূল্য উঠিয়া যাইয়া লাভে দাঁড়াইল।

কিন্তু যে মুসলমান বংশের ঐ জমিটা ছিল, তাহার একেবারে গরীব হইয়া গেল। তাহাদের দিনপাতের কষ্ট হইতে লাগিল। তাহারা আসিয়া বিশ্বনাথকে ধরিল,—যেন তিনি তাহাদের প্রতি কোন প্রকার দয়া করেন। কিন্তু সম্পত্তি ভুবনেশ্বরীর নামে থাকায় তিনি তাহাদিগকে ভুবনেশ্বরীর কাছে যাইয়া অনুরোধ করিতে বলিয়া দিলেন। সেইমত গরীব দুই তিনটি বালক আসিয়া ঠাকুরদালানে গিয়া বলিতে লাগিল, "মা, আপনি জানেন তো আমাদের একসময় অবস্থা ভাল ছিল। এখন সর্বস্ব গিয়াছে। দুটি ভাত জোটে না। আপনার তো খরচের টাকা উঠে গিয়ে অনেক লাভ হয়েছে। আমাদের জায়গাটা যদি ফিরিয়ে দেন তো আমরা দুটী ভাত পাই।" এইরূপে তাহারা অনেক অনুনয় বিনয় করিল। রামচন্দ্র দত্তের পিতা নৃসিংহ দত্ত জমিটা ফিরৎ দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক এবং অনেকেই অনিচ্ছুক। কিন্তু ভুবনেশ্বরী বালক কয়টীর কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "দেখ, এদের দিনকতক আগে গাড়ীঘোড়া ছিল। আজ এমন অবস্থায় পড়েছে যে দুটী ভাতের জন্য আমার কাছে

ভিক্ষা করতে এসেছে। আমারও তো ছেলেপুলে আছে। আজ না হয় খুব সচ্ছল অবস্থা, পরে কি হবে কে জানে। ঐ গরীব ছেলেদের অন্ন ফিরিয়ে দিই। ভগবান আমার ছেলেদের চিরকাল অন্ন দেবেন।" এইরূপ সাতপাঁচ ভাবিয়া বলিলেন, "তোমরা কাগজ তৈরী করে নিয়ে এস, আমি সই করে দেবো।" এবং তিনি তদ্রূপই করিলেন। এই কথাটা ভুবনেশ্বরী শেষ জীবন পর্যন্ত বলিতেন এবং নৃসিংহ দত্ত লালাবাগান যে অকারণে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে সেই বিষয়ে আপশোষ করিতেন। বংশেতে এই সকল পুণ্য থাকায় স্বামিজী এত জগদ্‌বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

বীরেশ্বরের আবাদ

গভর্নমেণ্ট সুন্দরবনে অনেক জমি বিলি করিতে লাগিল। বিশ্বনাথ দত্ত সুন্দরবনে কয়েক হাজার বিঘা জমি লইলেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে সেটা করিয়া দিলেন। সেইজন্য তাহার নাম হইল, 'বীরেশ্বরের আবাদ'। তিনি নানা কারণে অনেকদিন সেটা হাতে রাখিয়াছিলেন এবং বিস্তর খরচ করিয়াছিলেন। অবশেষে তাহা অপরের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এখন তাহা ভাল জমিদারী হইয়াছে কিন্তু মালিকানা সত্ব এখনও আছে। সে সব আইন আদালতের কথা। স্বামিজী ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তম্বিতম্বা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রাখাল, তুই আমার বীরেশ্বরের আবাদ ফিরিয়ে আন। তোর

বাপ জমিদার ছিল। তোর জমিদারী বুদ্ধিটা খুব আছে। তুই মামলা মকদ্দমা করে আমার নিজের জমিদারী আমায় এনে ফিরিয়ে দে।"

স্বামিজীর দিনকতক সেই বীরেশ্বরের আবাদ ফিরাইয়া আনিবার খুব একটা খেয়াল উঠিয়াছিল। তাহার পর সব ভুলিয়া গেলেন। এই দুটো জমি হাতে থাকায় এবং ওকালতী করিয়া অনেক অর্থ উপার্জন করায় সংসার খুব বড়মানুষী ধরণে চলিতে লাগিল। বীরেশ্বরের জীবনের প্রথম অংশটা এরূপ বড়মানুষী ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল। এইজন্য যখন সন্ন্যাসী হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তখনও কিন্তু মেজাজটা সেই বড়মানুষী চালে ছিল। তিনি মেজাজটা কখনও খাটো করিতে পারেন নাই। দুঃখ্ চেটেমিগিরি একেবারেই তিনি ভালবাসিতেন না।

গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা

মহেন্দ্র গোস্বামীর গলিতে বা ডোমপাড়াতে আগে একটা বড় পুকুর ছিল। তাহার ধারে অনেক গয়লার বাস ছিল। এখন পুকুর বুজাইয়া একটা মাঠ হইয়াছে এবং সেখানে অনেক ভদ্রলোক বাস করিতেছেন। ইংরাজী ১৮৭১ বা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গয়লাদের মাঠে বারোয়ারী পূজা হইল এবং সেখানে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইয়াছিল। আমরা দুই ভাই তখন খুব ছোট। শেষরাত্রে কাপড় পরিয়া গয়লাপাড়ার যাত্রা

শুনিতে গেলাম। চোখে তখন বেশ ঘুম ছিল। মাঠের গোয়ালারা আমাদের সকলকে চিনিত সেইজন্য খুব যত্ন করিয়া আমাদের লইয়া বসাইল। আমার বয়স তখন সবে চার বা পাঁচ এবং স্বামিজীর দশ বা এগার। সবে ভোর হইয়াছে এমন সময় একজন হরবোলা আসিয়া নানারকম পাখীর আওয়াজ করিতে লাগিল। তারপরে কতকগুলি গান হইল। তারপর একটি সঙ্‌ আসিল। সে জাজিমের উপর শয়ন করিল। পরে মাথা আর পা মাটিতে রাখিয়া পীঠের শিরদাঁড়াটাকে ধনুকের মত করিয়া ফেলিল এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানারকম নাচ দেখাইল। তারপর একটা ১০।১২ বছরের ছেলে আসিল, সেও পাক দিয়া নাচিতে লাগিল। তার খানিক পরে আমরা চলিয়া আসিলাম। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার কথা এইমাত্র মনে আছে।

বীরেশ্বর বাড়ীতে আসিয়াই এই যাত্রা সুরু করিয়া দিল। কাপড়খানি যাত্রাওয়ালাদের মত পরিয়া যাত্রায় যাহা যাহা শুনিয়াছিল তাহারই আবৃত্তি চলিল। এই লইয়া দিন-কতক বেশ খেলা চলিল।

আর একটি যাত্রার কথা

বৎসরে পাড়ায় একবার করিয়া রক্ষাকালী পূজা হইত এবং তাহাতে যাত্রা দেওয়া হইত। তাহাতে বোকা ধোপার এবং অন্যান্য যাত্রা হইত। কোন্ যাত্রায় ঠিক মনে নাই।

এক যমদূত আসিয়াছিল, সে পায়ে ঘুঙুর পরিয়া গাইতে-গাইতে বাহির হইল,

"তোমায় যম এসেছে নিতে।
তুমি দেরী করো না যেতে॥"

বীরেশ্বর ত বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া এই যাত্রা শুরু করিল আর মেঝেতে পা ঠুকিরা ঠুকিয়া নাচ আর ঐ গান আরম্ভ হইল। যাহার উপর রাগ হইত তাহাকেই বলিত,

"তোমায় যম এসেছে নিতে।
তুমি দেরী কোরো না যেতে॥"

ছেলেবেলায় এই রকম ছেলেখেলা চলিত।

ছায়াবাজী

আমরা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে বলিতাম, "ও দাদা, তুই আঙ্গুল দিয়ে ছায়াবাজী করনা।" আর দাদা অমনি আঙ্গুল দিয়া ছায়াবাজী দেখাইতে স্থরু করিত। তখন ঘরে পিতলের পিলসুজের উপর মাটীর প্রদীপ জ্বলিত। দাদা দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল জড়াইয়া আর অপর আঙ্গুল খুলিয়া নাড়াইত আর ছায়াতে দেখিলে সেটাকে মনে হইত যেন একটা বাদুড় উড়িয়া যাইতেছে। আর একটি দেখাইত, ঘোড়-সওয়ার ঘোড়ার উপর চড়িয়া দৌড়াইয়া যাইতেছে। সেটিও ঐ রকম আঙ্গুলে-আঙ্গুলে জড়াইয়া হইত। সেটা এখন ভুলিয়া গিয়াছি। এই রকম আঙ্গুলে-আঙ্গুলে জড়াইয়া দুর্গা, কার্তিক,

সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ করিত। একটা বিশেষ কথা এখানে এই যে এ-রকম আঙ্গুলে জড়ানোকে আমরা দুর্গা ঠাকুর বলি। কিন্তু আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম তখন দেখি একটি ছোট মেয়ে (Amil) আঙ্গুলে-আঙ্গুলে জড়াইয়া আহ্লাদ করিয়া আমাকে দেখাইতে আসিল যে সে হাতের মধ্যে গির্জা করিয়াছে। আমি দেখিলাম ছেলেখেলা সব দেশেতেই এক! তবে জাত হিসাবে খেলার নাম বদল হইয়াছে।

লুকোচুরি খেলা

ঠাকুরদালানে আমরা যত ছোট ছেলে মিলিয়া লুকোচুরি খেলিতাম। আর আমাদের চেয়ে যাহারা ছোট থাকিত, তাহাদের খেলায় লইতাম না। তবে কান্না ধরিলে তাহাদিগকে বেলেখেলা বলিয়া লইতাম। বড় বাড়ী, বড় বড় অনেক থাম কারণ তখন চকমিলান বাড়ী ছিল। লুকোচুরি খেলাটা বৈকালবেলা হইত কিন্তু এ খেলাটি নিস্তেজ, তাই ভাল জমিত না, শীঘ্র বন্ধ হইয়া যাইত।

রাজা কোটাল খেলা

এই খেলাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাই এস্থলে প্রদত্ত হইল। আমাদের ঠাকুরদালান উঠান হইতে এক মানুষ উঁচু ছিল। উঠান হইতে ঠাকুরদালানে উঠিতে ছয়টি ধাপ বা সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হইত। বীরেশ্বর রাজা হইয়া সকলের উঁচু ধাপটিতে বসিত এবং সম্পর্কে ও বয়সে

বড়, অপর ছেলেরা মন্ত্রী ও পারিষদ হইয়া তলার তলার ধাপে বসিত। কেহ রাজার সহিত এক আসনে বসিত না। একটি ছেলে চোর হইত এবং আর কতকগুলি ছেলে পাহারাওয়ালা হইত এবং আর আর ছেলেরা কোটাল ও অন্যান্য কর্মচারী হইত। আমি ঠাকুরদালানের পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতাম নিরপেক্ষ দ্রষ্টারূপে (Neutral observer) ও কে কোথায় লুকাইতেছে তাহা মাঝে মাঝে বলিয়া দিতাম। তারপর কোটাল ও পাহারাওয়ালারা চোরকে খুঁজিয়া পিছ্‌মোড়া করিয়া বাঁধিয়া লইয়া আসিত। চোর অনেক কাকুতিমিনতি করিত। এমন সময় কোটাল বলিয়া উঠিত, "মহারাজ, এই চোর, এ এই এই কাজ করেছে। কিন্তু প্রত্যেক কথার পূর্বে 'মহারাজ বা রাজামশাই' শব্দ ব্যবহার করিত। বীরেশ্বর তখন রাজা হইয়া বসিয়াছে কাজেই মহাগম্ভীর ও স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করিয়াছে। তখন যেন সে আর বালক নাই। সত্যই সে অন্যরকমের হইয়া যাইত। ভিন্ন চাহনি, ভিন্ন গলার আওয়াজ, ভিন্ন রকমের চালচলন, ভিন্ন রকমের হাত-পা-নাড়া। সত্যই সে এরূপ রাজার ভাব ধারণ করিত যে অপর ছেলেরা ভয়ে দমিয়া যাইত। সত্যকারের রাজা যেরূপ চোরের উপর দণ্ড বিধান দেয়, সে সেইরূপ দিত। একটা কাপড় পাকাইয়া তাহা দিয়া চোরকে ঘা কতক মারা হইত। কয় ঘা মারিতে হইবে তাহা রাজাই হুকুম দিত কিন্তু এমন একটি

গম্ভীর ভাব লইয়া বলিত যে তাহার ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার আর কাহারও সাহস থাকিত না। সত্যকারই যেন সে জন্মিয়াছিল রাজা হইয়া। ভবিষ্যতে স্বামিজী যে এত বড় হইয়াছিলেন এই খেলাতে তাহার অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় যে এই খেলায় যে যেরূপ সাজিয়াছিল, ভবিষ্যৎ জীবনে সে সেইরূপই হইয়াছিল। যাহারা চোর, কোটাল সাজিত, তাহারা সত্যসত্যই চোর কোটাল হইয়াছিল। যাহারা মোসাহেব সাজিত, তাহারা জীবনে মোসাহেবী করিয়া কাটাইল। যে রাজা সাজিত, সে সত্যকারের রাজা হইল। আর যে neutral observer অর্থাৎ নিরপেক্ষ দ্রষ্টা ছিল, সে নিরপেক্ষ দ্রষ্টাই রহিয়া গেল। এই সমস্ত কারণে এই গল্পটি বিশেষভাবে এস্থলে প্রদত্ত হইল।

রাজা হইবার ইচ্ছা

বাল্যকালে বীরেশ্বরের রাজা হইবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। সে সর্বদা মনে করিত যে বাবা ও কাকা ওকালতি করেন, তাহাতে আর বিশেষ কি হইল। সে নিজে রাজা হইবে এবং সকলকে শাসন করিবে। গল্পেতে যেমন রাজার সভা, রাজার সিংহাসন, মন্ত্রী ইত্যাদি সব শুনিত, কল্পনা করিয়া সেইসব সে চোখের উপর দেখিত এবং সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিয়াছে এরূপ মনে করিত। এমন কি মাঝে মাঝে অপর বালকদের মুখ ফুটিয়া বলিত, "দ্যাখ, আমি যদি রাজা হই, তোকে কোটাল করিব

এবং অমুককে মন্ত্রী করিয়া দিব।" এইরূপে খেলুড়িয়াদের চাকুরী দিবে বলিত কিন্তু সমকক্ষ কাহাকেও হইতে দিত না। সকলকে শাসন করিবে, সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে এই ভাবটি খুব বেশী ছিল। যাহারা স্নেহভাজন বা বিনীত, তাহাদিগকে আশ্রয় দিবে কিন্তু যাহারা প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহাদিগকে নিপাত করিবে এরূপভাব বাল্যকালে তাহার প্রবল ছিল এবং ভবিষ্যৎ জীবনে এই ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। লণ্ডনে একদিন বক্তৃতাকালে নিজের বাল্যকালের খেয়ালের কথা স্বামিজী বলিয়াছিলেন যে মনের গতির কত পরিবর্তন হয়, বাল্যকালে এক ভাব আর এখন এক ভাব। কিন্তু উভয় ভাবের মধ্যে একটা গতি আছে—তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। স্বামিজীর সেই বাল্যকালের ভাবই অন্যভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল এবং মন্ত্রী, কোটাল অন্যভাবে নিযুক্ত হইয়াছিল।

স্কুলের কথা

বীরেশ্বর একটু বড় হইলে স্কুলে গেল। তখন বিদ্যাসাগর স্কুল সুকিয়া ষ্ট্রীটে ছিল। এখন ঐ জায়গাটাতে লাহাদের বাড়ী হইয়াছে। স্কুল বাড়ীটার তখন চারিদিকে অনেকটা ফাঁকা জায়গা ছিল আর একধারে একটা পুকুর ছিল। তখনকার দিনে বিদ্যা-সাগর স্কুলের খুব নাম ছিল। সেইজন্য বাড়ীর সকল ছেলে বিদ্যাসাগর স্কুলে পড়িত। স্কুলে নাম লেখান হইল, 'নরেন্দ্রনাথ', যদিও বাড়ীতে নাম রহিল 'বীরেশ্বর' বা 'বিলে'। শিশু নরেন্দ্রনাথ

নিয়মিত স্কুলে যায়। একদিন ক্লাসের এক মাষ্টার এত জোরে কাণ ধরিয়া টানিয়াছিল যে শিশুর কাণ ছিঁড়িয়া গিয়াছিল এবং রক্তে চাপকান ইজের ভিজিয়া গিয়াছিল। তখন কাপড় পরিয়া স্কুলে যাওয়ার প্রথা ছিল না। ইজের চাপকান পরিয়া ছেলেরা স্কুলে যাইত। নরেন্দ্রনাথ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে খুব একটা হৈ-চৈ পড়িল। বিশ্বনাথ দত্ত ও তারকনাথ দত্ত মাষ্টারকে উকীলের চিঠি দিয়া আদালতে আনিয়া শাস্তি দিবেন ও স্কুলে আর ছেলেদের পড়িতে পাঠাইবেন না, এইরূপ স্থির করিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ নিজে মধ্যস্থ হইয়া নালিশ মকদ্দমা রহিত করিল এবং পরদিন যথাসময়ে স্কুলে যাইল। এই শাস্তির কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কানে যাইলে তিনি ছেলেদের মারিবার প্রথা উঠাইয়া দিলেন। কোনও শিক্ষক আর ছেলেদের মারিতে পারিতেন না। কিন্তু কয়েক বৎসর পর একদিন অপর একজন নূতন শিক্ষক আমার মাথার সহিত অপর একটি ছেলের মাথা ঠুকিয়া দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমি কোনও দোষ করি নাই বা দোষের কারণ জানিতাম না। বাড়ীতে আসিয়া এই বিষয়ে বলায় নরেন্দ্রনাথ সুপারিনটেনডেণ্ট শ্রীব্রজনাথ দে মহাশয়কে শিক্ষকের বিরুদ্ধে চিঠি লিখিয়া দিয়াছিলেন। ফলে নূতন শিক্ষকটির চাকুরী হইতে জবাব হইয়া গিয়াছিল।

স্কুলে পড়িবার কথা

নরেন্দ্রনাথ সকালবেলা খানিকক্ষণ এবং সন্ধ্যার পর খানিক-

ক্ষণ পড়িত। বাকী সব সময় খেলা ও দুরন্তপনা করিয়া বেড়াইত। স্কুলে দেড়টার ছুটির সময় খুব খানিকক্ষণ কপাটি খেলিত। সারা বৎসর বিশেষ মন দিয়া পড়িত না, তবে পরীক্ষার দু'এক মাস আগে খুব চেপে পড়াশুনা করিত। কিন্তু বরাবরই পরীক্ষায় খুব ভাল দাঁড়াইত। ক্লাসের মধ্যে খুব ভাল নম্বর পাইত। বিদ্যাসাগর স্কুলে তখন সংস্কৃত পড়াটা ভাল হইত। নরেন্দ্রনাথ সংস্কৃত, ইংরাজী ও ইতিহাস তিনটি বিষয় মন দিয়া শিখিত কিন্তু গণিতের বেলায় তত নয়। এ বিষয় তাহার ভাল লাগিত না তবে কাজ চলা গোছ শিখিত। কিন্তু সাউখুড়ি ও কথাবার্তাতে মাস্টার ও পণ্ডিতদিগকে মোহিত করিয়া রাখিত এবং তাঁহারা তাহাকে খুব ভালবাসিতেন। কয়েক বৎসর পর আমি যখন সেই সব মাষ্টার মহাশয়দের কাছে পড়ি তখন সকলেই আমাকে 'নরেন্দ্র' বা 'নরেন' বলিয়া ডাকিতেন। আমার নাম যে 'মহেন্দ্র' তাহা তাঁহাদের মনে থাকিত না, ভুলিয়া যাইতেন। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "ওহে ঐ নরেন নামটাই বেশী মনে আছে।" ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে মাষ্টার, পণ্ডিত মহাশয়রা নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ ভালবাসিতেন এবং সেইজন্য অনেকদিন স্মরণ রাখিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সব ক্লাসেই প্রধান ছাত্র ছিল। সহপাঠী ছাত্রদের সহিত তাহার বড্ড মেশামিশি ছিল। ছুটি পাইলেই, তা সে ক্লাসে বসিবার আগে কিংবা পরে বা দেড়টার সময়, তাহাদের সঙ্গে হয় কপাটি খেলা, নয় গল্প করা, নয় গান করা, নয় কাহাকে ভেঙ্গচাইয়া

রাগাইয়া দিত, যাহাতে অপর সকলে হাসিতে পারে। যা হোক একটা কিছু দুষ্টামি তাহার করা চাই। তাহার ভিতরে প্রভূত শক্তি ছিল তাই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত না, একটা নয় একটা কিছু করিত কিন্তু কখনও কাহারও কোন অনিষ্ট করিত না। সে খুব হাসাইতে পারিত ও নূতন নূতন ঠাট্টা করিতে পারিত। সেইজন্য সহপাঠীরা তাহাকে বড় ভালবাসিত এবং সে ক্লাসের সর্দার পোড়ো ছিল। সে সহপাঠী ছাত্রদের সকল সময় মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিত। স্বামিজী লণ্ডনে ষ্টার্ডিকে * একদিন বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ষ্টার্ডি, ছেলেবেলায় আমার ভিতর দেখতুম একটা অফুরন্ত শক্তি উঠ্‌ছে। যেন দেহ ছাপিয়ে সেটা উঠতো। আমি অস্থির হতুম, চুপ করে থাকতে পারতুম না। সেইজন্য সব সময় ছট্‌ফট্‌ করতুম, কিছু পড়তে না পেলে দুষ্টুমি করতুম। সে সময় যদি আমি তিন-চার দিন স্থির হয়ে বসে থাকতুম তা হলে হয় একটা ব্যামো হোতো নয় পাগল হয়ে যেতুম। কিছু করবার জন্য সব সময় ভেতরটা যেন কাঁপতো আমাকে অস্থির ক'রে তুলতো।"

বাড়ীতে পড়া

বাড়ীতে অনেকগুলি ছেলে পড়িত, সেইজন্য পড়িবার একটা আলাদা ঘর ছিল। মেঝেতে ছয় ইঞ্চি উঁচু তক্তা পাতা, সেটাকে আমরা প্লাটফর্ম (Platform) বলিতাম। মাঝে একটা চার টানাওয়ালা টেবিল, রাস্তার জানালার দিকে তিন চারিটি চেয়ার

* ই. টি. ষ্টার্ডি, স্বামিজীর একজন বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত।

এবং টেবিলের দক্ষিণদিকে একটা লম্বা বেঞ্চি। টেবিলের উপর কখন তেলের গেলাসে আলো দেওয়া হইত, কখনও বা চীনে মাটির বিঁদ বিঁদ করা রঙ্গিন একখানা বড় রেকাবি ছিল, তাহার উপর মাঝে মাঝে মাটির প্রদীপে আলো দিতাম। তখন কেরাসিন তৈল ছিল না। কড়িকাঠ থেকে একটা টানা পাখা ছিল এবং দেওয়ালে খানকয়েক ছবি ছিল। এই ঘরটিতে আমরা কয়ভাই পড়াশুনা করিতাম। আমাদের সঙ্গে রামচন্দ্র দত্তও পড়াশুনা করিত। রাখাল চন্দ্র ঘোষ যিনি পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, তিনিও এই ঘরে পড়াশুনা করিতেন।

পড়াশুনার নিয়ম

নরেন্দ্রনাথ অল্পসময়ের মধ্যে বই পড়িতে পারিত এবং মুখস্থ করিয়া ফেলিত। বইখানির মানে বুঝিবার আগে মুখস্থ করিয়া লইত। তাহার মেধা অদ্ভুত ছিল। সেইজন্য অল্প সময়ের ভিতর নিজের পড়া শেষ করিয়া ফেলিত। তাহার পর শ্লেটে খানিকক্ষণ অঙ্ক কষিত। তখন ম্যাপ বা মানচিত্র আঁকা এক প্রথা ছিল। এইজন্য রঙের বাক্স ও তুলি কিনিতে হইত। রঙের বাক্সে একটা ছোট চীনেমাটির বাটী থাকিত। সেই বাটিতে রঙ গুলিতে হইত। নরেন্দ্রনাথ আগে একটা কাগজে উট পেন্সিল দিয়া নক্সা করিয়া লইত এবং পরে ভিন্ন দেশ ভিন্ন রঙে আঁকিয়া দিত। নরেন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় বেশ ছবি আঁকিতে

পারিত। এই ছবিআঁকা বিদ্যা এক সময় তাহার কাজে লাগিয়াছিল। সে নিজের পড়া শেষ করিয়াই চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িত আর গুন্‌গুন্‌ করিয়া নিজের মনে এক গান ধরিত, না হয় কাহারও সহিত খুনসুড়ি বা ভেঙ্গচানো সুরু করিত। সে সকলকে অপ্রস্তুত করিতে পারিত। কথায় সকলকে হারাইতে পারিত কিন্তু তাহাকে কেহই কথায় হারাইতে পারিত না। এই সময় নরেন্দ্রনাথকে দেখিতাম যে একটি ছট্‌ফটে বালক। হাত-পা সব সময় নাড়িতেছে এবং চোখটা মিট্‌মিট্‌ করিতেছে, কি যে করিবে তাহা যেন ঠিক করিতে পারিতেছে না। কিন্তু বেশ একটা বড় কিছু কাজ করিবে তাহার জন্য যেন অস্থিরভাবে রহিয়াছে। সে কখনও কাহাকেও বকিতেছে, কখনও কাহাকেও হাসাইতেছে, কাহাকেও অপ্রতিভ করিতেছে, কাহাকেও আদর যত্ন করিতেছে কিন্তু সকলকে দলভুক্ত ও আপনার করিয়া লইতেছে। একবার যে ছেলে তাহার কাছে যাইত তাহাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বশে আনিত। উপস্থিত বুদ্ধি ও উপস্থিত কথা কহিবার ক্ষমতা তাহার অদ্ভুত ছিল। কিন্তু কখনও সে বিষণ্ণ হইত না। এই ছট্‌ফটে ভাবের ভিতর কখনও কখনও তাহাকে দেখিতাম যেন কি একটা ভাবে বিভোর হইয়া যাইত, যেন মনটা দেহ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। হাওয়ার ভিতর যেন কি একটা দেখিত আর এক দৃষ্টে খানিকক্ষণ স্থির হইয়া দেখিত। হঠাৎ মুখটা এমন গম্ভীর হইয়া যাইত যে সব হাসি ঠাট্টা বন্ধ হইয়া যাইত। সকলেই ত্রস্ত হইয়া যাইত। তাহার পর দু'তিন

মিনিটের পর আবার আগেকার বিলে হইয়া দুষ্টামি করিত। মাঝে মাঝে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিত, "আমি রাজা হবো। আমি এটা করবো, ওটা কোরবো।" আর সেই বিষয়ে খানিকক্ষণ বড়্ বড়্ করিয়া বলিয়া যাইত, "ছ্যাখ্ এটা এই করতে হবে, এটা ঐ করতে হবে, এটা এইবারেতে হবে" এই রকম খানিকক্ষণ বলিতে সুরু করিত। দেখা যাইত যে আগে যে সব কথাবার্তা বলিত তাহার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নাই। কখনও কখনও মাঝখান থেকে উচ্চৈঃস্বরে স্বগত বলিয়া উঠিত। তখন যেন সে স্বতন্ত্র বালক হইত। তাহার পর সে ঝোঁকটা কাটিয়া যাইলে মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিত আর গালগুলি কুঁচকাইত যেন কত অপ্রতিভ হইয়াছে। কখনও মুচকাইয়া হাসিত আর নাকটা কুঁচকাইয়া উপরে তুলিত। এই রকম মাঝে মাঝে দেখিয়া খেলুড়িয়ারা অনেক সময় তাহাকে 'পাগলা বিলে' বলিত। তাহারা আরও বলিত, "বিলেটা বেশ ছেলে ভাল, খুব হাসি তামাসা স্ফুর্তি করতে পারে, কিন্তু মাথাটা একটু খারাপ, মাঝে মাঝে পাগলের মত কি বলে।" অনেকেই আহ্লাদ করিয়াই হউক বা ব্যঙ্গছলে হউক তাহাকে 'পাগলা বিলে' বলিয়া ডাকিত।

ছবি আঁকা ও গান গাওয়া

দাদা* ছেলেবেলায় ছবি আঁকিত। দু'চার আনা করিয়া

যে রঙের বাক্স পাওয়া যাইত সেই রঙ দিয়া আঁকিত। বেশ ভাল আঁকিতে পারিত। 'মোহন্তের এ কি কাজ' থিয়েটার আমরা অভিনয় করিতাম। দাদা কাগজের উপর পালা আঁকিয়া পর্দায় মারিয়া দিত।

দাদা গানও বেশ গাহিত। 'গিন্নীর তারকেশ্বর যাওয়া হবে না, কর্তা করেছে মানা' ঠাকুরমাকে আমরা বলিতাম, গাইতাম আর নাচিতাম। ঠাকুমা বকতেন, কিন্তু বকলে কি হবে? পাঁচ ছয়জন মিলে নাচিতাম। কে শুনবে ওঁর বকুনি।

ঠাকুর দালানে আমরা থিয়েটার করিতাম। আমি টিকিট কালেক্টর হইতাম। মাথায় কাপড় দিয়ে পাগড়ি বাঁধলে টিকিট কালেক্টর হয় ত? আমি তাই সাজিতাম।

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের সময় কতকগুলি গান চলন ছিল, আমরা সে সব গানও করিতাম।

রাঙা দিদির বিয়ে হবে
কনে হয়ে বসবে পীঁড়ে

....

হায় কি করলে ঠাকুরঝি,
হায় কি করলে ঠাকুরঝি॥

....

বল্ দ্যাওরা এর বাওরা খুঁজে নাহি পাই
রাঙা দিদির বরটি আমি পাই।

তখন যতকিছু হোতো, গান ছড়া, সব রাঙা দিদিকে নিয়ে। কিন্তু তখন আমরা কি মানে জানিতাম! গাইতে শুনে গাইতাম।

শরৎ মহারাজের উক্তি

স্বামিজী বরাহনগর মঠ বা অন্য কোনস্থলে ছেলেবেলাকার গল্প বলিয়াছিলেন। এই পড়িবার ঘরে নাকি নরেন্দ্র একাকী বসিয়া পড়িতেছে। হঠাৎ দেখিল এক জ্যোতির্ময় পুরুষ নরেন্দ্রনাথের দেহে মিশিয়া গেল। সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের যে অবয়ব, তাহার সহিত বুদ্ধমূর্তির সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য ছিল।* ইহা আমার শুনা কথা। আমি নিজে বিশেষ জানি না। তবে বিশিষ্ট লোকের কাছে শুনা, এইজন্য এস্থলে প্রদত্ত হইল।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি

---

* স্বামিজীর নিজ উক্তিতেই দেখা যায় যে ভগবান বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁহার গৃহে আসিয়াছিলেন।

—ভগিনী নিবেদিতা প্রণীত, স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে পৃঃ ২৭ দ্রষ্টব্য। সঃ

পুণ্যদর্শন শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থাবলীর তালিকা

১।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান (২য় সংস্করণ)	৩·৫০ ন.প.
২।	শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী ১ম খণ্ড, (২য় সংস্করণ)	৩·২৫ ,,
	ঐ ২য় খণ্ড, (২য় সংস্করণ)	৩·০০ ,,
	ঐ ৩য় খণ্ড, (২য় সংস্করণ)	৩·০০ ,,
৩।	লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ)	২·৭৫ ,,
৪।	লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—২য় খণ্ড (২য় সং)	২·৭৫ ,,
৫।	কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ (২য় সংস্করণ)	২·০০ ,,
৬।	স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী	১·২৫ ,,
৭।	শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী	৩·০০ ,,
৮।	শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান (২য় সংস্করণ)	·৫০ ,,
৯।	গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ)	·৫০ ,,
১০।	দীন মহারাজ	·৫০ ,,
১১।	ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ	১·০০ ,,
১২।	সাধুচতুষ্টয় (২য় সংস্করণ) (সারদেশ্বরী আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত)	১·২৫ ,,
১৩।	মাতৃদ্বয় (গৌরী মা ও গোপালের মা)	·৫০ ,,
১৪।	ব্রজধাম দর্শন	১·৫০ ,,
১৫।	নিত্য ও লীলা (বৈষ্ণব দর্শন)	১·০০ ,,
১৬।	বদরীনারায়ণের পথে	২·২৫ ,,

১৭।	পাশুপত অস্ত্রলাভ	৫·০০ ,,
১৮।	মায়াবতীর পথে	১·০০ ,,
১৯।	গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত)	১·৫০ ,,
২০।	সঙ্গীতের রূপ	১·৫০ ,,
২১।	নৃত্যকলা	১·০০ ,,
২২।	পশুজাতির মনোবৃত্তি	·৭৫ ,,
২৩।	তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান	২·০০ ,,
২৪।	বাংলা ভাষার প্রধাবন	২·০০ ন. প.
২৫।	খেলাধূলা ও পল্লীসংস্কার (২য় সংস্করণ)	·২৫ ,,
২৬।	খেলাধূলা ও পল্লীসংস্কার (নেপালী অনুবাদ)	·১২ ,,
২৭।	জে. জে. গুডউইন	১·০০ ,,
২৮।	গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান	৫·০০ ,,
1.	Natural Religion	1·00N.P.
2.	Theory of Motion	2·00 ,,
3.	Cosmic Evolution—Part I	4·00 ,,
4.	Mind	1·00 ,,
5.	Mentation	2·00 ,,
6.	Reflections on Woman (To be had of Saradeswari Asram.)	
7.	Principles of Architecture	2·50 ,,
8.	Homocentric Civilization	1·50 ,,
9.	Lectures on Status of Toilers	2·00 ,,
10.	Lectures on Education	1·25 ,,

11.	Federated Asia	4·50 ,,
12.	Nation	2·00 ,,
13.	New Asia	1·00 ,,
14.	Temples and Religious Endowments	·50 ,,
15.	National Wealth	5·50 ,,
16.	Rights of Mankind	·50 ,,
17.	Appreciation of Michael Madhusudan and Dinabandhu Mitra (2nd. Edition)	1·00 ,,
18.	Formation of the Earth	2·00 ,,
19.	Theory of Vibration	2·00 ,,
20.	Triangle of Love	1·50 ,,
21.	Dissertation on Paintings (2nd. Ed.)	3·75 ,,
22.	Reflections on Society	1·50 ,,

THE

MOHENDRA PUBLISHING COMMITTEE

3, Gour Mohan Mukherji Street, Calcutta-6